Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহারিয়া সুলতানা নিঝুম

রোলঃ ২১৫০০২৫৬

১৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহারিয়া সুলতানা নিঝুম

রোলঃ ২১৫০০২৫৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সিরাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাহারিয়া সুলতানা নিঝুম, আইডিঃ ২১৫০০২৫৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shahariya 16/12/2023

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সাহারিয়া সুলতানা নিঝুম

আইডিঃ ২১৫০০২৫৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সিরাহ কি?	৬
সিরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব	৬
নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরবের অবস্থা	৭
ইবরাহিম (আ) এর কাহিনি	৮
যমযম কুপের উদ্ভব	৮
কুরাইশ বংশের উৎপত্তি	১১
রাসুল ﷺএর বংশাবলি	১৩
রাসুল ﷺ এর সৌভাগ্যময় জন্ম	১৪
বক্ষ বিদারন ঘটনা	১৫
ফিজার যুদ্ধ	১৬
হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা	১৭
খাদিজা রা এর সাথে বিবাহ	১৯
রাসুল ﷺএর নবুওয়াতি জীবন, রিসালাত ও দাওয়া	২১
রাসুল ﷺএর মাক্কীজীবন	২২
হেরা গুহায় নবুওয়াতের বানী	২২
জিবরাইল (আ) এর আগমন	২২
সরাসরি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ	২৬
প্রথম তিন বছর গোপন দাওয়াহ	২৬
ইসলাম কবুলকারি প্রথম দল	২৭
প্রথম স্বলাতের নির্দেশ ও আদায়	৩০
প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ	৩১
রাসুল ﷺএর বিভিন্নমুখী শত্রুতা	৩২
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত	৪১
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত	৪২
হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	৪৩
রাসুল ﷺ কে হত্যার ষড়যন্ত্র	৫০
কতিপয় বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহন	৫৫

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
-উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ	৫৭
কুরাইশদের প্রতিনিধি	৬৮
বয়কটের ঘটনাক্রম ও বয়কটের বছর	৭২
শিয়াবে আবু ত্বলিবে অবস্থান	৭৪
অঙ্গীকার বিনষ্ট	৭৫
ইয়াওমুল হুজন/শোকের বছর	৭৯
রাসুল ﷺ এর সাথে সাওদাহ (রা) এর বিবাহ	৮৪
মক্কার বাইরে দাওয়াত প্রদান	৮৫
তায়েফে দাওয়াত প্রদান	৮৫
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের দাওয়াত প্রদান	৯৫
আয়িশা রা এর সাথে বিবাহ	৯৭
উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ	৯৭
আক্বাবার প্রথম বাইয়াত	১০৯
মাদিনায় ইসলাম প্রচারক দল	১১০
আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াত	১১০
বাইয়াতের দফাসমূহ	১১২
বাইয়াতের বিপজ্জনক দিকের স্মরণ	১১৪
বাইয়াতের পূর্নতা লাভ	১১৬
কুরাইশদের আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুত	১১৬
ইয়াসরিবী নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের ক্ষোভ	১১৭
হিজরতের প্রথম বাহিনী	১১৯
রাসুল ﷺ এর হিজরত	১২৪
মদীনার পথে রাসুল ﷺ	১৩০
রাসুল ﷺএর মদিনায় প্রবেশ	১৩১
রাসুল ﷺএর মাদানী জীবন	১৩৫
নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	১৩৫
মসজিদে নববীর নির্মান	১৩৬
শেষ কথা	১৯৪

সীরাহ কি?

সীরাহ] سِيرَة[শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। সীরাহ বলতে এমন একটি পথ বুঝায় যার উপর দিয়ে একজন ব্যক্তি তার জীবনভর হেঁটে চলে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে জানা হয়, ততক্ষণ মূলত ওই ব্যক্তির জীবনপথেই ভ্রমণ করা হয়।

সীরাহ বলতে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ -এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় আল্লাহর রাসূল সাঃ -এর জীবনীকেই বোঝানো হয়।

সীরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব

রাসূলে করীম সাঃ-এর জীবনী অধ্যয়ন করা কেবল শখ কিংবা আগ্রহের বিষয় নয়। বরং তা আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নির্দেশ।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

[সূরা আল আহযাব ৩৩:২১]

১/ ইসলামকে গভীরভাবে জানা

২/ রাসুল ﷺএর প্রতি ভালোবাসা

৩/কুরআন কে অনুধাবন

৪/ সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ

৫/সিরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত

৬/মুসলিম হিসেবে নিজেদের চরিত্রের গঠন

নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

নাবী (সাঃ)-এর জীবন চরিত বলতে বুঝায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত সেই বার্তা বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির বাস্তবায়ন বা রূপায়ণ যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানব জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এবং যার মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার গাঢ় অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত আলোকোজ্জ্বল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মানুষের দাসত্ব ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবিষ্ট করেছেন। এমনকি ইতিহাসের চিত্রকেই পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং মানবজগতের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেছেন।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নাবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন ধারার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ না করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক ইসলামিক আরবের ভৌগোলিক সীমারেখা, আরব ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও অবস্থান এবং তাদের ক্রমোন্নতির ধারা এবং সে যুগের রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব প্রদান ও গোত্রসমূহের শ্রেণীবিন্যাশকে বিভিন্ন দীন-ধর্ম, সম্প্রদায়, আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রসহ পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

নিম্নে নবুয়তের পূর্বে আরবে সংগঠিত কিছু বিশেষ ঘটনা-

ইবরাহীমের (আ) কাহিনি

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও সদ্যজাত পুত্র ইসমা'ঈলকে নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো জনবসতি, না কোনো ফল-ফসল!'

ইবরাহীম (আ) চুপ করে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনও তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?'

এবার উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

হাজেরা বললেন, 'তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।'

হাজেরা (আ) জানতেন, যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইবরাহীম(আ) তাদেরকে এমন জনমানবহীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ

তাআলাই তাঁকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইবরাহীম(আ) চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুআ করেন। এই চমৎকার দুআটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে,

"হে আমাদের রব, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)

ইবরাহীম চলে গেলেন। মা হাজেরার কাছে অল্প যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আর ইসমা'ঈল তখনো ছিলেন দুধের শিশু। হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল। ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাঁদছে। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন। একটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, এ পাহাড়ই পরে আস-সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপর উঠে একবার ডানে তাকান, আবার বাঁয়ে তাকান, কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোনো মানববসতির সন্ধান পেলেন না। এরপর পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় ফিরে এলেন, কাপড় গুটিয়ে এবার উঠতে লাগলেন আরেকটি পাহাড়ে, পরবর্তীতে যা আল-মারওয়া নামে পরিচিত হয়। এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও ডানে-বায়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না।

একদিকে পুত্র ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা কিছু পাওয়ার আশায় আস-সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন। এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজটি কোথা

থেকে এসেছে তা বোঝার জন্য আশেপাশে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, শিশু ইসমা'ঈলের পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরীল সেখানে যমযম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজেরা এই কুপের আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড খুশিতে তিনি পানির উৎসের দিকে দৌড়ে গেলেন। মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল, তাই পানি শুকিয়ে যেতে পারে চিন্তা করে হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মতো একটি জায়গা তৈরি করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, 'ইসমা'ঈলের মায়ের উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত', অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখতেন তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

চোখের সামনে ক্ষুধায় কাতর পুত্রের কষ্ট ও কান্না দেখে নিশ্চয়ই হাজেরা অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল, হয়তোবা তিনি কাঁদছিলেনও। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মু'মিনাহ ও মুত্তাক্বী বান্দী। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এক মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হাজেরা তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কষ্টের মাঝে ছিলেন। হাজেরার এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, 'আর এ কারণেই আমরা (হাজ্জের সময়) সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করি।' অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমরা হাজেরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। হাজেরা যদি জানতে পারতেন যে এমন এক সময় আসবে যখন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাহলে তিনি মুখে এক চিলতে হাসি নিয়েই সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করতেন!

এ ঘটনার শিক্ষা:

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ কিছু পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কী ঠিক করে রেখেছেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাজেরাও এক সময় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে

গিয়েছিলেন আর সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেওয়া হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিদান।

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি

জুরহুম গোত্র দীর্ঘ দিন ধরে মক্কায় ছিল। ধীরে ধীরে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের স্থলে বনু খুযা'আ গোত্রকে পাঠান। বনু খুযাআ জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। বনু খুযাআ ছিল একটি ইয়েমেনি গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রসমূহের মতো এটিও ইয়েমেন ত্যাগ করেছিল। অবশেষে তারা হিজাযে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এদিকে জুরহুম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে দুটো কাজ করলো, প্রথমত, তারা যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দ্বিতীয়ত, আল-কাবার ভেতরে যে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল সেগুলো তারা সাথে করে নিয়ে গেল।

জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার শাসন ক্ষমতা চলে গেল বনু খুযাআর হাতে। যদিও সে সময় ইসমাঈলের বংশধররা সংখ্যায় অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং অনেক গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় একটিমাত্র শাখা গোত্র রয়ে যায় আর এই শাখা গোত্রটির নাম হলো কুরাইশ। অর্থাৎ ইসমাঈল থেকে উদ্ভূত গোত্রগুলোর একটি হলো কুরাইশ। তবে মক্কার কর্তৃত্ব তখনো কুরাইশদের হাতে নয়, বরং বনু খুযাআর হাতেই ছিল।

বনু খুযাআর অন্যতম নেতা ছিল আমর ইবন লুহাই আল খুযাই। আরবের ধর্মীয় পটভূমির আলোচনায় তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা ছিল কুসাই ইবন কালব-সে সকল কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা থেকে বের করে দেয়। প্রথমবারের মতো মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় নেতৃত্ব কুসাই তথা কুরাইশদের হস্তগত হয়। কুসাইর হাতে তখন কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব চলে আসে। সে একই সাথে কাবা ঘরের

সিকায়াহ ও নিফাদা এর ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল হয়। সিকায়াহ ও নিফাদা হলো কাবায় আগত হাজীদের খাবার ও পানি পান করানোর দায়িত্ব।

এই কাজগুলো সাধারণভাবে খুব আহামরি মনে না হলেও আরবে আল্লাহ তাআলার অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি ব্যাপার ছিল। এই দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে হাজ্জ করতে আগত হাজীদের মেহমানদারির দায়িত্ব বর্তায় কুরাইশদের উপর। তৎকালীন কুরাইশদের রাজনৈতিক পরিষদ আন-নাদওয়ার কর্তৃত্বও কুসাই ইবন কালবের হাতে ছিল। আন-নাদওয়া ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংসদের মতো। তার হাতে আরও ছিল আল-লিওয়ার নিয়ন্ত্রণ। আল-লিওয়া ছিল যুদ্ধের ব্যানার, অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সকল ক্ষমতাও ছিল কুসাইয়ের হাতে। এক কথায় বলা যায় যে কুসাই ইবন কালব ছিল তৎকালীন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি।

কুসাই ইবন কালবের মৃত্যুর পর এসব ক্ষমতা তার সন্তানরা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়। কুসাইয়ের নাতি আমর পৈত্রিক সূত্রে হাজীদের খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। সচরাচর শুধুমাত্র স্যুপ দিয়ে হাজীদের আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু আমর এ খাবারে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে স্যুপের মধ্যে ভেজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে খাবারটির স্বাদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো করার পদ্ধতিকে আরবিতে 'হাশম' বলা হয়। এই হাশম থেকেই তখন আমরকে হাশিম নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রপিতামহ। হাশিম বিয়ে করেছিলেন মদীনার এক মহিলাকে। এরপর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। গাযাতে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'শায়বা'। শায়বা মানে হলো বৃদ্ধ লোক। ছোটো শিশুর এরূপ অদ্ভুত নামকরণের কারণ হলো জন্ম থেকেই তার মাথার কিছু চুল ধূসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শায়বার মা ইয়াসরিবে পিতামাতার কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। তাই শায়বার ছোটবেলা কেটেছিল ইয়াসরিবে তার নানাবাড়িতে। আর এই ইয়াসরিবে যখন রাসূলুল্লাহ হিজরত করলেন তখন সেই ইয়াসিরবের নাম বদলে হয়ে গেলো মদীনা।

রাসুল ﷺ এর বংশাবলি

পরম্পরাগত সূত্রে নাবী কারীম (সাঃ)-এর বংশাবলীকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রথম পর্যায় হচ্ছে আদনান পর্যন্ত যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেত্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আদনান হতে উপরে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেত্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দ্বিমত বা মতান্তর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটিকে কেউ কেউ মুলতুবী রেখেছেন, কেউ কেউ বা আবার কথাবার্তাও বলেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের সময়কাল হচ্ছে ইবরাহীম (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হচ্ছে, তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছুটা ভুলভ্রান্তি রয়েছে। উপরে উল্লেখিত পর্যায় তিনটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আকারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথম পর্যায়ঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) বিন হাশিম (‘আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা‘ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালিক বিন নাযর (ক্বায়স) বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকাহ (আমির) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা’আদ্দ বিন আদনান।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ আদনান থেকে উপরের দিক অর্থাৎ আদনান বিন উদাদ বিন হামায়সা’ বিন সালামান বিন ‘আওস বিন বুয বিন ক্বামওয়াল বিন উবাই বিন ‘আউওয়াম বিন নাশিদ বিন হিযা বিন বালদাস বিন ইয়াদলাফ বিন ত্বাবিখ বিন যাহিম বিন নাহিশ বিন মাখী বিন ‘আইয বিন আ’বক্কার বিন উবাইদ বিন আদ-দু’আ বিন হামদান বিন সুনবর বিন ইয়াসরিবী বিন ইয়াহযুন বিন ইয়ালহান বিন আর’আওয়া বিন ‘আইয বিন দীশান বিন ‘আইসার বিন আফনাদ বিন আইহাম বিন মুক্বসির বিন নাহিস বিন যারিহ বিন সুমাই বিন মুযী বিন ‘আওযাহ বিন ‘ইরাম বিন ক্বাইদার বিন ইসামাঈল বিন ইবরাহীম (আঃ)।

তৃতীয় পর্যায়ঃ ইবরাহীম (আঃ) হতে উপরে ইবরাহীম বিন তারিহ (আযর) নাহুর বিন সারু' অথবা সারুগ বিন রাউ' বিন ফালাখ বিন 'আবির বিন শালাখ বিন আরফাখশাদ বিন শাম বিন নূহ (আঃ) বিন লামিক বিন মাতাওশালখ বিন আখনুন (কথিত আছে এ নাম ছিল ইদরিস (আঃ)-এর নাম) বিন ইয়াদ বিন মাহলায়ীল বিন ক্বায়নান বিন আনূশ বিন শীস বিন আদম (আঃ)।

রাসুল ﷺএর সৌভাগ্যময় জন্ম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজী পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মাদ সুলায়মান মুনসুরপুরী সাহেব (রহঃ) এর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।

ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মা বলেছেন যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিল। ইমাম আহমাদ (রঃ) ইরবায বিন সারিয়া কর্তৃক অনরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[2] নাবী (সাঃ)-এর জন্মের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবুওয়াতের পূর্বাভাস স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কিসরাপ্রাসাদের চৌদ্দটি সৌধচূড়া ভেঙ্গে পড়ে, প্রাচীন পারসীক যাজকমন্ডলীর উপাসনাগারগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসা অগ্নিকুন্ডগুলো নির্বাপিত হয়ে যায়, বাহীরা পাদ্রীগণের সরগম গীর্জাগুলো নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এ বর্ণনা হচ্ছে ইমাম বায়হাক্বী, তাবারী এবং অন্যান্যদের। তবে এগুলোর কোন সঠিক ভিত্তি নেই এবং তৎকালীন কোন ইতিহাসও এর সাক্ষ্য দেয় না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই আমিনাহহ আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নব জাতককে কোলে তুলে নিয়ে কা'বাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামন্ডিত এ শিশুর মুখমন্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এ নব জাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মাদ। আরববাসীগণের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।

তাঁর মাতার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবূ লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। ঐ সময় তার কোলে যে সন্তান ছিল তাঁর নাম ছিল মাসরুহ। নাবী কারীম (সাঃ)-এর পূর্বে সুওয়ায়বা হামযাহ বিন আব্দল মুত্তালিবকে এবং পরে আবূ সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমীকেও দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।

বক্ষ বিদারন ঘটনা

এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নাবী (সাঃ) বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম[1] বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস (রাঃ) হতে সহীহুল মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী (সাঃ) যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।' তারপর হৃৎপিন্ডটিকে একটি সোনার

তস্তরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা হালীমাহকে বলল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। হালীমাহ এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাবী (সাঃ)-এর মুখমন্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবাযত্নে লিপ্ত হলেন।[2] আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

এভাবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে কিশোর থেকে যুবকে পরিনত হলেন রাসুল ﷺ।

ফিজার যুদ্ধ

নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান। এ যুদ্ধ 'ফিজার যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত। কেননা বনু কিনানাহর বার্রায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাহদের উপর ক্বায়সদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাহদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, কোন পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়াত গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভুলে যায়। একে ফিজার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে

নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই,

এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'।

একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ কালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে, ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয়ই তার সে আহবানে সাড়া দিব।

অধিকন্তু, এ ব্যাপারে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের বাসভবনে আমি এমন এক অঙ্গীকারনামায় শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে আমি আসন্ন প্রসবা উটও পছন্দ করি না এবং যদি ইসলামের যুগে এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমাকে আহবান জানানো হয় তাহলেও 'আমি উপস্থিত আছি কিংবা প্রস্তুত আছি' বলতাম।[1]

'হলফ-উল-ফুযুল' প্রতিষ্ঠার অন্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রত্যক্ষ পটভূমির কথাও জানা যায় এবং তা হচ্ছে, জুবাইদ নামক একজন লোক মক্কায় এসেছিলেন কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তাঁর নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের জন্য তিনি আব্দুদ্দার, মাখযুম, জুমাহ, সাহম এবং আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের

আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনের প্রতি কেউই কর্ণপাত না করায় তিনি জাবালে আবূ কুবাইশ পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত ছিল। আবৃত্তি শ্রবণ করে জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব দৌড়ে গিয়ে বলেন, 'এ লোকটি অসহায় এবং সহায় সম্বলহীন কেন? তাঁরই অর্থাৎ জুবাইরের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরে আস বিন ওয়ায়িলের নিকট থেকে জুবাইরের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।'

খাদিজা (রা) এর সাথে বিবাহ

সিরিয়া থেকে যুবক নাবী (সাঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদীজাহ (রা.)-এর অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে ওঠে। অধিকন্তু, তাঁর দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মাদ (সাঃ) মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাঁকে পতি হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন বাসনা ক্রমেই তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর পূর্বে বড় বড় সরদার, নেতা ও প্রধানগণ অনেকেই তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি কোনটিই মঞ্জুর করেন নি। তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আমানতদারিতায় ক্রমশ মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট ব্যক্ত করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নাফীসা খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রস্তাব সম্পর্কে নাবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নাবী কারীম (সাঃ) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ ত্বালিব এ ব্যাপারে খাদীজাহ (রাঃ)-এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর

বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইটি প্রাণ বিশ্বমানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

নাবী কারীম (সাঃ) এবং খাদীজাহ (রাঃ)-এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদীজাহ (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নাবী কারীম (সাঃ)-এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজাহ (রাঃ)-এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাত্বিমাহ ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'।

নাবী কারীম (সাঃ)-এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাত্বিমাহ (রাঃ) ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাত্বিমাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম (সাঃ)-এর ছয় মাস পর।

রাসুল ﷺএর নবুওয়াতী জীবন,রিসালাত ও দাওয়াহ

আলোচনা ও অনুধাবনের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পয়গম্বরী জীবন কালকে আমরা দুইটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কাজকর্মের ধারা প্রক্রিয়া এবং সাফল্য। সাফল্যের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর এক অংশ থেকে ছিল ভিন্নধর্মী এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। অংশ দুটি হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় তের বছর

২. মদীনায় অবস্থান কাল দশ বছর

তারপর মক্কী ও মাদীনী উভয় জীবনকাল বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ছিল স্তর ক্রমিক এবং ভিন্নধর্মী। তাঁর পয়গম্বরী জীবনের উভয় অংশ পর্যালোচনা এবং পরীক্ষণ করলে অনুক্রমিক স্তরগুলো সমীক্ষা করে দেখা বহুলাংশে সহজতর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কাবস্থান কাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি আনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

১. সর্ব সাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকান্ডের স্তর (তিন বছর)।

২. মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছরের শেষ নাগাদ)।

৩. মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নুবুওয়াতী বর্ষের শেষ ভাগ হতে হিজরত পর্যন্ত।।

মদীনার জীবন এবং মদীনায় অবস্থান কালের স্তর অনুযায়ী বিস্তৃত আলোচনা যথাক্রমে সন্নিবেশিত হবে।

রাসুল ﷺএর মাক্কী জীবন

হেরা গুহায় নবুওয়াতের বানী

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

পুরো রমাযান রাসূলুল্লাহ (ষাঃ) হেরা গুনায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুয়তরূপী এক মহান আসমানী নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের

যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চাইতে মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুয়ত প্রদানের প্রাককালে তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন। নাবী কারীম (সাঃ)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়তের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস যা ছিল নবুওয়তের সময় সীমার ছয়চল্লিশতম অংশ এবং নবুওয়তের সময়সীমা ছিল তেইশ বছর। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাববুল আলামীন জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতে করীমা নাযিল করে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নবুওয়তের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন।

বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণাদি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই জিবরাঈল (আঃ)'র আগমনের প্রকৃত দিন তারিখ ও সময় অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের

সন্ধানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নাবী কারীম (সাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন এব সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।

আসুন, এখন আমরা উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেই। এটা নৈসর্গিক নূর বা আসমানী দীপ্তির মতো এমন এক আলোক রশ্মি ছিল যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে থাকে, জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে থাকে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হতে থাকলেন। নিরবাচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তণ না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুণরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

পূর্বের মতো খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তিনি হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরাগুহার নির্জনতায় অবস্থান করতে থাকেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই।' তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই''। তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়-

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) [العلق:1: 3])

অর্থঃ সেই প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড থেকে। পড় সেই প্রভূর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।''

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নাবী কারীম (সাঃ) কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদীজাহ বিনতে খোওয়ালেদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'

এরপর খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে অরকা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লেখতেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কী যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।'

ওয়ারাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হিরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন ওয়ারাকার নিকট।

আনুপূর্বিক সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহবল কণ্ঠে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই মানুষ যিনি মুসা (আঃ)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।'

তারপর বলতে থাকলেন, 'হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।'

অরাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একী! ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?'

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।' তিনি আরও বললেন 'শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তা বাহক কোন সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বাগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।' তিনি আরও বললেন, 'মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনাক্রমে ওহি নাজিল পুনরায় শুরু হয় এবং রাসুল ﷺএর কাছে আল্লাহ তায়ালা হতে সরাসরি দাওয়াহ প্রদানের বিষয় নির্দেশ আসে।

সরাসরি ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

৩ বছর গোপন প্রচার

সূরাহ মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াত প্রথম থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

‘১. ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)। ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪, তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর। (আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১-৭)

সূরাহ মুদ্দাসসিরের উপযুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-অর্চনা ব্যতীত কোন দীন ছিল না। তাদের সঠিক কোন হজ্জ ছিল না, তবে তারা হজ্জ করতো যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছে। তাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত কোন সৎচরিত্র ছিল না। তাদের কোন সমস্যা তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না। তা সত্ত্বেও মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ মক্কাবাসীই ছিলেন কা’বাহর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেমগণ। এ জন্যই দূরবর্তী স্থানের তুলনায় মক্কায় সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তর্পণে ও সঙ্গোপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কাবাসীগণের সামনে আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায়।

ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল

এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কথা যে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমন্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নাবী (সাঃ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর প্রতি এত বেশী অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহবানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নাবী- পত্নী খাদীজাহতুল কোবরা (রাঃ) বিনতে খুওয়াইলিদ, তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ বিন শোরাহবীল কালবী,[1] তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবূ ত্বালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন শিশু ছিলেন এবং তাঁর সওর গুহার সঙ্গী আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)। এরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন।

তারপর আবূ বাকর (রাঃ) ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোমল-স্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাসের অধিকারী, সচ্চরিত্র এবং দরাজ দিল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, দূরদর্শিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সৎ সাহচর্যের কারণে তাঁর নিকট লোকজনের গমনাগমন প্রায় সব সময় লেগেই থাকত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিকট আগমন ও প্রত্যাগমনকারী এবং আশপাশে বসবাসকারীগণের মধ্যে যাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন তাঁর সামনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উসমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ত্বালহাহ বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিলাল হাবশী (রাঃ)-ও ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পর ইসলাম কবূল করেন বনু হারিস বিন ফিহর গোত্রের আবূ 'উবায়দাহ 'আমির বিন জাররাহ (রাঃ), আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমী (রাঃ), আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম (রাঃ), উসমান বিন মাযউন যুমাহী (রাঃ), এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কুদামা এবং আব্দুল্লাহ, উবায়দাহ বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়দ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরাত তামীমী (রাঃ), জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন 'আস আল উমাবী ও তার স্ত্রী আমীনাহ বিনতে খালাফ,

অতঃপর তার ভাই ‘আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমাহী ও তার স্ত্রী ফাতিমাহহ বিনতে মুখাল্লিল ও তার ভাই খাত্তাব বিন হারিস এবং তার স্ত্রী ফুকাইহাহ বিনতে ইয়াসার ও তার ভাই মা’মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবূ ‘আওফ, নাঈম বিন আবদুল্লাহ বিন নুহাম আদবী (রাঃ), এদরে সকলেই কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী’আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রূমী, ‘আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন, উম্মু আইমান বারাকাত হাবশী, উম্মুল ফযল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ (আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী), আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীর গুণে গুণম্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায় নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেই কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।

প্রথম স্বলাত আদায়

প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয় তাতে নামাজের নির্দেশেনা বিদ্যমান ছিল । ইবনে হাজার বলেন যে, নাবী কারীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.) মি'রাজের ঘটনার পূর্বে অবশ্যই সালাত পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে সালাত ফরজ ছিল কি ছিল না সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে একটি করে সালাত ফরজ ছিল।

হারিস বিন উসামাহ ইবনে লাহী'আর মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের মিলিত পরম্পরা সূত্রের বরাতে যায়দ বিন হারিসাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হল তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাকে অযুর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। যখন অযু শেখা সমাপ্ত হল তখন এক চুল্লি পানি লজ্জা স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। ইবনে মাজাহও এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বারা বিন আযিব এবং ইবনে আব্বাস হতেও ঐ ধরণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, সালাত প্রাথমিক ফরজকৃত কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[1]

ইবনে হিশামের বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) এবং সাহাবীগণ (রা.) সালাতের সময় ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং গোত্রীয় লোকজনদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে সালাত আদায় করতেন। আবূ ত্বালিব এক দফা নাবী কারীম (সাঃ) এবং আলীকে সালাত আদায় করতে দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত বিষয়টি অবগত হলে এর উপর দৃঢ় থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।[2]

প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণ এসব ইবাদত করতেন। সালাত সংশ্লিষ্ট ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত বা আদেশ নিষেধের কথা জানা যায় না। সে সময়কার ওহীতে মূলত সে সব বিষয় বর্ণিত হয় যা বিভিন্নভাবে তাওহীদের বর্ণনা, তাদেরকে আত্মশুদ্ধির প্রতি উৎসাহিতকরণ, উন্নত চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা যেন তা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধকরণে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ যা

অন্তরের খোরাক হয়, ঈমানদারদের তৎকালীন মানব-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্নতর এক পরিবেশে পরিভ্রমণ করাতে থাকে।

এভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু ইসলামের দাওয়াত গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাসূল (সাঃ)-ও তা লোকসমাজে প্রকাশ করতেন না। তবে কুরাইশরা ইসলামের খবর জানতো ও মক্কাতে ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকসমাজে এর মৃদু গুঞ্জন চলতে থাকে। আবার কেউ একে ঘৃণাও করতো এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা ভাব দেখাতো। তবে সামনা সামনি কিছু বলতো না যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ তাদের দীন-ধর্মে হস্তক্ষেপ করতেন এবং তাদের ভিত্তিহীন ও মনগড়া ইলাহ মূর্তিসমূহের সমালোচনা না করতেন।

প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

(وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) [الشعراء:214]،

''আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরাহ শু'আরার আয়াত এবং এ সূরাহয় সর্ব প্রথমে মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈলসহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদলবলে ফেরাউনকে নিমজ্জিত

করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ফেরাউন এবং তাঁর কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে গিয়ে মূসা (আঃ)-কে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল এ ছিল সেই কর্মকান্ডের একটি সমন্বিত আলোচনা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হক পন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র নাবী কারীম (সাঃ) এবং সাহাবীগণের (রাঃ) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরাহর মধ্যে নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথাঃ ফেরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবুল আইকার পরিণতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল কওম নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কী কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং ঈমানদারগণ অজস্র বিপদাপদ পরিবেষ্টিত থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

রাসুল ﷺএর বিভিন্নমুখি শত্রুতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে তার সম্মান-মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকলো এবং তাদের কাছে বিষয়টা খুব কঠিন হয়ে গেল যে তাদের ধৈর্য্যের ভেঙ্গে গেল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শত্রুতার হাতকে প্রশস্ত করে দিল। ফলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস, সংশয়-সন্দেহ, বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি

আবূ লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গ ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। সে ছিল বনু হাশিমের অন্যতম নেতা। সে অন্যান্যদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যাপারে বেশি ভীত ছিল। সে ও তার স্ত্রী ছিল ইসলামের গোড়ার শত্রু। এমনকি অন্যান্য কুরাইশগণ যখন ঘুণাক্ষরেও নাবী কারীম (সাঃ)-কে নির্যাতন করার চিন্তা-ভাবনা করেন নি তখনে আবূ লাহাবের আচরণ ছিল অত্যন্ত মারমুখী। বনু হাশিমের বৈঠকে এবং সাফা পর্বতের নিকট তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফা পর্বতের উপর নাবী কারীম (সাঃ)-কে আঘাত করার জন্য তিনি একখণ্ড পাথর হাতে উঠিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর আবূ লাহাব যে কত পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিলেন তার আরও বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার ছেলে ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মেয়ের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কোচ্ছেদ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'মেয়ের সঙ্গে আবূ লাহাব তার দু'ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে তিনি তার দু'ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

তাঁর পাশবিকতার আরও একটি ঘটনা হচ্ছে নাবী কারীম (সাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ যখন মারা যান তখন তিনি (আবূ লাহাব) উল্লাসে ফেটে পড়েন, টগবগিয়ে দৌড়াতে তার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এ দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদরূপে পরিবেশন করেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর লেজকাটা (পুত্রহীন) হয়েছে।

অধিকন্তু, ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজ্বের মৌসুমে আবূ লাহাব নাবী কারীম (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বাজার ও গণজমায়েতে তার পিছনে লেগে থাকতেন এবং জনতার মাঝে অপপ্রচার চালাতেন।

তারিক্ব বিন আব্দুল্লাহ মুহারিবীর বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ব্যক্তি নাবী কারীম (সাঃ)-কে শুধু মাত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং কোন কোন সময়

তিনি নাবী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন, যার ফলে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যেত।[4]

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (যার নাম আরওয়া) ছিলেন হারব বিন উমাইয়ার কন্যা আবূ সুফইয়ানের বোন। নাবী (সাঃ)-এর প্রতি অত্যাচার ও জুলম ও নির্যাতনে তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্য অংশিদারিণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলা। এ সকল দুষ্কর্মে তিনি স্বামী থেকে পশ্চাদপদ ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চলার পথে এবং দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে কিংবা পুঁতে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া, কটুক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজকর্মে তিনি লিপ্ত থাকতেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফেৎনা ফাসাদের আগুন জ্বলিয়ে দেয়া এবং উস্কানী দিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টিকরা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এজন্যই আল কুরআনে তাঁকে) الحطبখড়ির বোঝা বহনকারিণী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যখন তিনি অবগত হলেন তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নিন্দাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খোঁজ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মসজিদুল হারামে কাবাহ গৃহের পাশে অবস্থান করছিলেন। আবূ বকর সিদীকও (রা.) তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আবূ লাহাব পত্নী যখন এক মুষ্ঠি পাথর নিয়ে বায়তুল হারামে (পবিত্র গৃহে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখভাগে এসে দণ্ডায়মান হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দেয়ার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখতে পেলেন না।

অথচ আবূ বাকর (রাঃ)-কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আবূ বাকর তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ করে আমি যদি এখন তাকে পেতাম তার মুখের উপর এ পাথর ছুঁড়ে মারতাম। দেখ আল্লাহর শপথ আমি একজন মহিলা কবি। তারপর সে এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।[5]

مذمما عصينا * وامره ابينا * ودينه قلينا

অর্থ : আমরা মন্দের অবজ্ঞা করেছি। তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং তাঁর দ্বীনকে (ধর্ম) ঘৃণা এবং নীচু মনে করে ছেড়ে দিয়েছি।

এর পর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। তিনি কি আপনাকে দেখেন নাই?' আল্লাহর নাবী বললেন,

)ما رأتنى لقد أخذ الله ببصرها عنى(

"না, তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ তার দর্শন শক্তিকে আমার থেকে রহিত করে দিয়েছিলেন।[6]

আবূ বাকর বাযযারও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে আরও কিছু কথা সংযোজন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবূ লাহাব পত্নী আবূ বাকর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আবূ বাকর! তোমার সঙ্গী আমার বদনাম করেছে। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'না, এ ঘরের প্রভুর শপথ! তিনি কোন কবিতা রচনা কিংবা আবৃত্তি করেন না। আর না, সে সব তিনি মুখেই আনেন। তিনি বললেন, 'তুমি সত্যই বলছ'।

এ সব সত্ত্বেও আবূ লাহাব সেই সব লোহমর্ষক ঘটনাবলী ঘটিয়ে চলেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা ও প্রতিবেশী। উভয়ের ঘর ছিল পাশাপাশি এবং লাগালাগি। এভাবেই তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশীগণও তার উপর নির্যাতন চালাতেন।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সকল লোকজনেরা নাবী কারীম (সাঃ)-কে তার বাড়িতে জ্বালা-যন্ত্রণা দিতেন তাদের নেতৃত্ব দিতেন আবূ লাহাব, হাকাম বিন আবিল আস বিন উমাইয়া, উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব , আদী বিন হামরা সাক্বাফী, ইবনুল আসদা হুযালী; এঁরা সকলেই ছিলেন তার প্রতিবেশী। এঁদের মধ্যে হাকাম বিন আবিল আস[7] ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর তাদের জুলম নির্যাতনের ধারা ছিল এরূপ, তিনি যখন সালাতে রত হতেন তখন ছাগলের নাড়ি ভূড়ি ও মলমূত্র এমনভাবে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত তার উপর। উনুনের উপর হাড়ি পাতিল চাপিয়ে রান্নাবান্না করার সময় এমনভাবে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত হাড়ি পাতিলের উপর। তাদের থেকে নিস্কৃতি

লাভের মাধ্যমে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পৃথক মাটির ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন।

যখন তাঁর উপর এ সকল আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো তখন সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে দরজায় খাড়া হতেন এবং তাঁদের ডাক দিয়ে বলতেন,

يا بنى عبد مناف أي جوار هذا

"ওহে আবদে মানাফ প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর এ কেমন আচরণ।"

তারপর আবর্জনা স্তুপে নিক্ষেপ করে আসতেন।[৪]

উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব আরও দুষ্ট প্রকৃতির এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন। সহীহুল বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, 'একদা নাবী কারীম (আঃ) বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আবূ জাহল এবং তার বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'কে এমন আছে যে, অমুকের বাড়ি থেকে উটের ভূড়ি আনবে এবং মুহাম্মাদ যখন সালাত রত অবস্থায় সিজদায় যাবে তখন তার পিঠের উপর ভূড়িটি চাপিয়ে দিবে। ঐ সময় আরববাসীগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব [9] উঠল এবং কথিত ভূড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকল। যখন নাবী কারীম (সাঃ) সিজদায় গেলেন তখন সেই দুরাচার নরাধম ভুঁড়িটি নিয়ে গিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। আমি সব কিছুই দেখছিলাম, কিন্তু কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। হায় যদি আমার মধ্যে তাকে বাচানোর কোন ক্ষমতা থাকত।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আরও বলেন, 'এর পর তারা দানবীয় আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল। মনে হল ওদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। হায় আফসোস! যদি তারা একটু বুঝত যে, কী সর্বনাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে'। একদিকে অর্বাচীনের দল যখন দানবীয় আনন্দ ও নারকীয় কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তখন

দুনিয়ার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সিজদারত অবস্থায় বেহেশতী আবেহায়াত পানে বিভোর ছিলেন। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য।

নাবী তনয়া ফাত্বিমাহ (রা.) এ দুঃসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং ভূঁড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নীচ থেকে উদ্ধার করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শির উত্তোলন করে তিনবার বললেন :

[اللهم عليك بقريش]

হে আল্লাহ! এ কুরাইশদিগকে পাকড়াও কর।"

যখন তিনি আল্লাহর নিকট এ আরয পেশ করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধা বোধের সৃষ্টি হল এবং তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ শহরের মধ্যে প্রার্থনা কবুল হয়ে থাকে। তারপর তিনি নাম ধরে কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আরজি পেশ করলেনঃ

اللهم عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووالد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابى معيظ

'হে আল্লাহ আবূ জাহেলকে, উতবাহহ বিন রাবী'আহকে, শায়বাহ বিন রাবী'আহকে অলীদ বিন উতবাহহকে, উমাইয়া বিন খালাফ এবং উক্ববা বিন মু'আইত্ব কে পাকড়াও কর।'

রাসূলুল্লাহ সপ্তম জনের নাম বলেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারীর তা স্মরণ নেই। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার জীবন! এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাদের নামে আরজি পেশ করেছিলেন বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়োর মধ্যে পতিত অবস্থায় আমি তাদের সকলকেই দেখেছি।[10]

উমাইয়া বিন খালাফের এ রকম এক স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে, যখনই সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখত তখনই তাঁকে ভর্ৎসনা করত এবং অভিশাপ দিত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হয় :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

‘প্রত্যেক অভিশাপকারী, ভর্ৎসনাকারী এবং অন্যায়কারীর জন্যই রয়েছে ধ্বংস (আল-হুমাযাহ ১০৪ : ১)

ইবনে হিশাম বলেন যে, ‘হুমাযাহা’ ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে অশ্লীল বা অশালীন কথাবার্তা বলে ও চক্ষু বাঁকা টেড়া করে ইশারা ইঙ্গিত করে এবং ‘লুমাযাহ’ ঐ ব্যক্তি যে অগোচরে লোকের নিন্দা বা বদনাম করে ও তাদের কষ্ট দেয়।[11]

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনে খালফ ‘উক্ববা বিন আবী মু’আইতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এক দফা উক্ববা নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট বসে কিছু শুনল। উবাই এ কথা জানতে পেরে তাকে খুব ধমক দিল, তার নিন্দা করল। তার নিকট অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে কৈফিয়ত তলব করল এবং বলল যে, তুমি গিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে এস। শেষ পর্যন্ত উক্ববা তাই করল। উবাই বিন খালফ নিজেই একবার মরা পচা হাড় নিয়ে তা চূর্ণ করে এবং জোরে ফুঁ দিয়ে তার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে উড়িয়ে দেয়।[12]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্যাতনকারী দলের মধ্যে যারা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে আখনাস বিন শারীক সাক্বাফী। আল কুরআনে তার ৯টি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তার মন মানসিকতা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

“তুমি তার অনুসরণ কর না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে (বার বার মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে মানুষের কাছে) লাঞ্ছিত। - যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, - যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, - কঠোর স্বভাব, তার উপরে আবার কুখ্যাত।” (আল-ক্বালাম ৬৮ : ১০-১৩)

আবূ জাহল কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে কুরআন শ্রবণ করত। কিন্তু তার সে শ্রবণ ছিল নেহাৎই একটি মামুলী ব্যাপার। তার এ শ্রবণের মূলে আন্তরিক বিশ্বাস, আদব কিংবা আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ছিল না। সেটাকে কিছুটা যেন তার উদ্ভট

খেয়াল বলা যেতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অশ্লীল কিংবা কর্কশ কথাবার্তার মাধ্যমে কষ্ট দিত এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করত। অধিকন্তু, অন্যায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সফলতা হওয়াটাকে গর্বের ব্যাপার মনে করে গর্ব করতে করতে পথ চলত। মনে হতো সে যেন মহা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ সম্পাদন করেছে। কুরআন মাজীদের এ আয়াত তার স্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।[13]

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ

"কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, সলাতও আদায় করেনি।" (আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫ : ৩১)

সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রথমদিকে যখন থেকে সালাত পড়তে দেখল তখন থেকে সালাত হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এক দফা নাবী কারীম (সাঃ) মাকামে ইবরাহীমের নিকট সালাত পড়ছিলেন এমন সময় সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই সে বলল, মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকতে বলিনি? সঙ্গে সঙ্গে সে নাবী কারীম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধমকও দিল। নাবী কারীম (সাঃ)-ও ধমকের সুরে তাঁর এ কথার কঠোর প্রতিবাদ করলেন। প্রত্যুত্তরে সে বলল, "হে মুহাম্মাদ। আমাকে কেন ধমকাচ্ছ? আল্লাহর শপথ দেখ এ উপত্যকায় (মক্কায়) আমার বৈঠক সব চেয়ে বড়'। তার উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[14]

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

"কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক।" (আল-আলাক্ব ৯৬ : ১৭)

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জামার বুকের অংশ ধরে জোরে হেঁচকা একটান দিলেন এবং এ আয়াতে কারীমা পাঠ করলেন :

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

"দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ, -তারপর তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।"

(আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫ : ৩৪-৩৫)

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সেই শত্রু বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ। আল্লাহর শপথ, তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মক্কার পর্বতের মধ্যে বিচরণকারীদের মধ্যে সব চেয়ে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি।

তার এ অসার এবং উৎকট অহমিকা প্রকাশের পরও আবূ জাহাল সেসব থেকে নিবৃত্ত হল না। বরং তার অনাচার ও অন্যায় আচরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলল। যেমনটি সহীহুল মুসলিমে আবূ হুরাইরাহহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এক দফা আবূ জাহল কুরাইশ প্রধানদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের সম্মুখে মুহাম্মাদ (সাঃ) কি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলায় লাগিয়ে রাখে? প্রত্যুত্তরে বলা হল, হ্যাঁ"।

এরপর সে আস্ফালন করে বলল, 'লাত ও উযযার কসম, যদি আমি তাকে পুনরায় সেই অবস্থায় (সালাতরত) দেখি তাহলে গ্রীবা পদতলে পিষ্ঠ করে ফেলব এবং মুখমণ্ডল মাটির সঙ্গে আচ্ছা করে ঘর্ষণ দিয়ে মজা দেখিয়ে দিব'।

কিছু দিন পর ঘটনাক্রমে একদিন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাত পড়তে দেখে ফেলে এবং কুরাইশ প্রধানদের নিকট স্বঘোষিত সংকল্প কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে পরিলক্ষিত হল যে, অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দু'হাত নড়াচড়া করে কী যেন এড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে আবূল হাকাম! তোমার কী এমন হল যে, তুমি অমন ধারা ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে পড়লে? সে উত্তর করল, 'আমার এবং তার মধ্যে আগুনের এক গর্ত রয়েছে, ভয়াবহ বিভীষিকাময় ও ভীতপ্রদ শিকল রয়েছে'।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'সে যদি আমার নিকট যেত তবে ফেরেশতাগণ তার এক একটা অঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।

উপর্যুক্ত বর্ণনা হচ্ছে, মুশরিকগণ (যারা ধারণা করতো তারা আল্লাহর বান্দা এবং তার হারামের অধিবাসী) মুসলমান এবং নাবী কারীম (সাঃ)-এর উপর যেভাবে অবর্ণনীয় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল তার সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এ রকম ভয়াবহ সংকটময় অবস্থায় এমন যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানগণ মুশরিকদের এমন বর্বোরোচিত অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারে। অতএব তিনি (সাঃ) দুটি হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে করে সহজ পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালানো যায় এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। সিদ্ধান্ত দুটি হলো:

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম মুখযুমীর বাড়িকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে মনোনিত করলেন।

২. নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে হাবশায় হিযরত করার আদেশ করলেন।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

অন্যায় অত্যাচারের উল্লেখিত বিভীষিকাময় ধারা-প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সূচিত হয় নবুওয়ত চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে। জুলুম নির্যাতনের শুরুতে এর মাত্রা ছিল সামান্য। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরমে পৌঁছল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই এ বিভীষিকার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাধ্য হলেন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরাহ যুমার।

এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'

(لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10]

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায়

‘ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।’ (আয-যুমার ৩৯ : ১০)

অত্যাচারের মাত্রা যখন ধৈর্য ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে কুরআন মাজীদ পড়তে এবং নামায আদায় করতে না দেয়ার মানসিক যন্ত্রণা যখন চরমে পৌঁছল তখন তারা দেশান্তরের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। তিনি বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু, সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।[1]

এ দিকে মুহাজিরগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে থাকলেন। পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে, এ দলটি রজব মাসে মক্কা থেকে হিজরত করেন। কিন্তু সেই বছরটির রমাযান মাসে কাবা শরীফে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় হিজরত ছিল খুবই কঠিন। কেননা প্রথম হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের ব্যাপারে কুরাইশগণের তুলনায় মুসলমানদের সচেতনতা ও ঐকান্তিকতার মাত্রা ছিল অনেক গুণে বেশী। উপরন্তু নিরীহ, নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যার

ফলে কুরাইশগণের তরফ থেকে কোন অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহীহুল সালামতে গিয়ে পৌঁছলেন হাবশের সম্রাটের দরবারে।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে আম্মার (রাঃ)-এর হিজরত সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে) এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন। আল্লামা সুলাইমান মুনসুরপুরী দৃঢ়ভাবে মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ বলেছেন।

হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুণ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে 'আমর বিন আস এবং গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে (যিনি তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজ্জাশী এবং বেতরীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ দূত দ্বয়কে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে তারা সর্বপ্রথম বেতরীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যার ভিত্তিতে তারা মুসলিমগণকে হাবশ হতে বাহির করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে বেতরীকগণ (পাদ্রীগণ) এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতরীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন। তাঁদের আরজির বিবরণ হচ্ছে এরূপঃ

‘‘হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ণ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছেন। এর চাইতে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন। আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচিনের পিতামাতা, মুরুববী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দু’জনকে দূত হিসেবে দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এদের ভালমন্দ সম্পর্কে ভালভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।’

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, ‘মহামান্য সম্রাট! এরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, ‘আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহবান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা‘আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা সম্রাট সমীপে পেশ করার জন্য উত্তম মানসিক প্রস্তুটি সহকারে সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা

পরিত্যাগ করেছ এবং এমন কি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন্ ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন, 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহবান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু, নামায, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন, 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর (মহিমান্বিত প্রভূর) পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পয়রবী করে চলছি। সুতরাং আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভূ আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোন শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যে সব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্নগোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা চান এ সত্য, সুন্দর, শাশ্বত ও সুনির্মল দ্বীপে থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তাঁরা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমন কি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষন্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, 'জী হ্যাঁ"।

নাজ্জাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।

জা'ফর (রাঃ) আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় ভাবগদগদ চিত্তে সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন:

নাজ্জাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জাফরের তিলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী 'আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট থেকে এ নির্দেশ লাভের পর তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আদম সন্তানদের গোমরাহ করার ব্যাপারে আযাযীল শয়তান যেমন একের পর এক ই প্রয়োগ করতে থাকে এরাও তেমনি একটি কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কৌশল প্রয়োগের ফন্দি ফিকির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে 'আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা ও সতেজতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহ বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু 'আমর বিন আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন। পরের দিন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, 'আমর বিন আস বললেন, 'হে

সম্রাট! এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। কারণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে তত্ত্বগত মত পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন মসীহ (জেসাস) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু পার্থক্য হেতু মুসলিমগণ বলেন ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তত্ত্বগত এ পার্থক্য হেতু মুসলিমদের সংশয় এ কারণে যে, এ কথা বললে সম্রাট নাজ্জাশী যদি বা বিরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎই একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল দৃঢ়চিত্ত মুসলিমগণ পরক্ষণেই মনস্থির করে ফেললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সেটাই হবে তাঁদের মূলমন্ত্র এবং সেটাই হবে তাঁদের বক্তব্য তাতে ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

নাজ্জাশী বললেন, 'হ্যাঁ', এখন তো তোমরা হাঁ হুঁ বলে সমর্থন জ্ঞাপন করবেই।'

তারপর নাজ্জাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে অন্য লোকদের কথা গ্রহণ করেন নি, আমি কোন লোকের কোন কথা গ্রহণ করতে পারি না।'

এ ঘটনার বর্ণনাকারিণী উম্মু সালামাহ বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকন সহ কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন চরিতকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের পর। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলঅ হয়েছে 'আমর বিন আস দু'দফা নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতি সূত্রে সম্রাট নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথনের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার হুবহু মিল রয়েছে। অধিকন্তু ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে এবং ঐ একই প্রশ্নোত্তরের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই, উপর্যুক্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিমদের ফেরত আনার জন্য

‘আমর বিন আস মাত্র একবার নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছিলেন এবং ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবাসিনিয়ায় হিজরতের পর পরই।

রাসুল ﷺকে হত্যার ষড়যন্ত্র

যা হোক মুশরিকগণের চাতুর্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল অকৃতকার্যতায় এবং তাঁরা এটাও উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কিংবা তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে স্বদেশভূমির বাইরে সাফল্য লাভের কোনই সম্ভবানা নেই। কাজেই তাদের প্রচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে কিংবা শায়েস্তা করতে হলে স্বদেশের সীমানার মধ্যেই তা করতে হবে। তাছাড়া ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল হিসেবে তাঁরা এটাও স্থির করলেন যে, এদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে হয় বল প্রয়োগ করে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে আর না হয় তাঁর অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মযাদার পাত্র অথবা কারো আশ্রিত। এসত্ত্বেও তারা উদ্যত মুশরিকদের থেকে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবুও তারা মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে মুশরিকদের সম্মুখে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করতেন এবং সংগোপনে আল্লাহর নিকট দু’আ করতেন এতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারতো না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি (সাঃ) এমনভাবে প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন যে তাঁকে আর কোন শক্তিই আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হলো না। দাওয়াতে রেসালাতের কাজ যখন এরকম এক পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁর পিয়ারা হাবীবকে নির্দেশ দেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আল-হিজর ১৫ : ৯৪)

উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর মুশরিকদের কাজ কেবল এটুকুই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মর্যাদা ও প্রভাবের কারণে এ ব্যতিত আর কিছুই করার ছিল না। অধিকন্তু মুহাম্মাদ (আঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন আবূ ত্বালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মুশরিকগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তার কারণে মুহাম্মাদের উপর যে কোন কিছু করতে ভীত ছিল। তাছাড়া বনু হাশিমের পক্ষ থেকেও তাদের আশংকা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। যখনই মুশরিকরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মনস্থ করতো তারা দেখতো যে, তাদের এ কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দাওয়াতের কাছে খড়কুটোর মতোই তুচ্ছ ও অকার্যকর।

অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তারা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতিষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল :

একদা আবূ লাহাবের পুত্র উতায়বা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ; আমি

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ)ও

এ আয়াত দুটোকে অস্বীকার করছি। এর পরই সে নাবী কারীম (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। সে জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর পাক মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রহমতে থুথু সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে নাই। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর সমীপে দু’আ করলেন,

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

“হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।”

নাবী কারীম (সাঃ)-এর দু'আ আল্লাহর সমীপে গৃহীত হল এবং এভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিছু সংখ্যক কুরাইশ লোকজনের সঙ্গে একদফা উতায়বা বিদেশ গেল। যখন তারা শাম রাজ্যের জারকা নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করল তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাদের চারপাশে ঘোরাফিরা করতে থাকল। ওকে দেখেই ওতায়বা ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়! হায়!, আমার ধ্বংস। আল্লাহর শপথ, সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এ মর্মেই মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দেখ আমি শাম রাজ্যে অবস্থান করছি অথচ তিনি মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করছেন'।

উতায়বার এ কথা শ্রবণের পর তার সঙ্গী সাথীরা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাকে তাদের মধ্যস্থানে শুইয়ে দিল যাতে বাঘ এসে সহজে তার নাগাল না পায়। কিন্তু গভীর রাতে সেখানে বাঘ এসে সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা উতয়বার নিকটে যায় এবং তার মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়।

এক দফা উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন তার ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তার অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে।

ইবনে ইসহাক্বের এক দীর্ঘ বর্ণনায় চরমপন্থী কুরাইশগণের এরূপ দুরভিসন্ধির আভাষ পাওয়া যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস হতে ইবনে ইসহাক্ব তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এক দফা কুরাইশ মুশরিকগণ কাবাহ'র হাতীমে সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ

আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা তার প্রতি কটাক্ষ করায় নাবী (সাঃ)-এর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তার বহিঃপ্রকাশ তার চেহারা মুবারকে আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাকে বিদ্রপাত্মক কথাবার্তা বলে ভর্ৎসনা করল। আমি এবারও তার মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নাবী কারীম (সাঃ) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

أتسمعون يا معشر قريش اما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح

'হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।'

তাদের প্রতি নাবী (সাঃ)-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল (তাদের উপর মূর্ছা পাওয়ার মতো অবস্থা এসে পড়ল) এবং এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল যে তাদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ুই বসে রয়েছে। এমনকি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর সব চেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, 'আবূল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।'

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তার গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবূ বকর (রা.) তাকে বাচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি

ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : 'তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছে যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভু?'

এর পর তারা নাবী (সাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন যে, এটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি। (সার সংক্ষেপ শেষ হল)।

সহীহুল বুখারীতে উরওয়া বিন জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন আসকে মুশরিকগণ নাবী (সাঃ)-এর উপর সব চেয়ে কঠিন যে নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা আমার সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, একদা নাবী (সাঃ) কাবাহ গৃহের হাতীমে সালাত পড়ছিলেন এমন সময় উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব সেখানে আগমন করলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজ কাপড় দ্বারা তাঁর গ্রীবা ধারণ করে অত্যন্ত জোরে চপেটাঘাত করলেন এবং গলা টিপে ধরলেন। এমন সময় আবূ বকর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উক্ববার দু'কাঁধ ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে এ জন্যই হত্যা করছ যে, তিনি বলেছেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ। আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকরের নিকট যখন এ আওয়াজ পৌছল যে, 'আপন বন্ধুকে বাঁচাও' তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বের হলেন। তার মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিল। যাবার সময় আবূ বকর বলতে বলতে গেলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে শুধু এ কারণে হত্যা করছ যে, তিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।

এরপর মুশরিকগণ নাবী কারীম (সাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বকরের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তার অবস্থা ছিল এরূপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল।।

এরই মাঝে মক্কার তৎকালীন বেশ বড় বড় সাহাবা ইসলাম গ্রহন করেন।তাদের এই ইসলাম গ্রহন ইসলামের প্রচার প্রসার বহুগূনে বাড়িয়ে দিয়েছিল।উনাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

হামজাহ (রা) এর ইসলাম গ্রহণ:

মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সেই মেঘ মালার মধ্য থেকে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত চমকিত হওয়ায় মজলুমদের পথ আলোকিত হল, হামযাহ মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগ। সম্ভবতঃ তিনি যুল হিজ্জাহ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা যাঁর উপর রহম করেন তাঁর পক্ষেই ইসলামের অমিয় ধারা থেকে এক অাঁজলা পান করা সম্ভব হয়। যদিও হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও আল্লাহর তা'আলার খাস রহমতেরই ফলশ্রুতি তবুও তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিশেষ

ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ, এক দিবসে আবূ জাহল সাফা পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নাবী কারীম (সাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাবী (সাঃ)-কে দেখে অনেক কটু কাটব্য করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বললে নাবী কারীম (সাঃ) তার কথাবার্তার কোন উত্তর দিলেন না। আবূ জাহল একটি পাথর তুলে নিয়ে নাবীজী (সাঃ)-এর মাথায় আঘাত করল। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল। তারপর সে ক্বাবা'হ গৃহের নিকটে কুরাইশগণের বৈঠকে গিয়ে যোগদান করল।

আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ানের এক দাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের উপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করছিল। হামযাহ (রাঃ) মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই (তখনো তাঁর হাতে তীর ধনুক ছিল এমতাবস্থায়ঃ) সে তাঁকে আবূ জাহলের অন্যায় অত্যাচার এবং নাবী (সাঃ)-এর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল। ঘটনা শ্রবণ করা মাত্র তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। এ মুহূর্তে বিলম্ব না করে তিনি এ সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটে চললেন যে, যেখানেই আবূ জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে সেখানেই তিনি তার ভূত ছাড়াবেন। তিনি তার খোঁজ করতে করতে গিয়ে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ও হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তার দ্বীনেই আছি।

এরপর তিনি কামানের দ্বারা তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যাতে সে আহত হয়ে গেল। এর ফলে আবূ জাহলের বনু মখযুম ও হামযাহ (রাঃ)-এর বনু হাশিম গোত্রদ্বয় একে অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবূ জাহল এভাবে সকলকে নিরস্ত করল যে, আবূ উমারাকে যেতে দাও। আমি প্রকৃতই তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালমন্দ এবং আঘাত দিয়েছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। মুশরিকগণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিত। এটা

বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কাজেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তার দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের শক্তি এবং সম্মান দুই-ই বৃদ্ধি পেল।

উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমন্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে। হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (সাঃ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলতেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلٍ بن هشام

'হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে

থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি।

উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীতমুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথের চলার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এ জন্য প্রায়শঃই তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নাবী কারীম (সাঃ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ) [الحاقة:40، 41]

‘‘যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল (‘আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।’ (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, ‘আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (সাঃ) তিলাওয়াত করলেনঃ

(وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تَنزِيْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ) إلى آخر السورة [الحاقة:42، 43]

‘‘ এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।’ (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, ‘সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।

প্রকৃতপক্ষে, উমার (রাঃ)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতানায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-

দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী কিংবা বনু যুহরা কিংবা বনু মাখযুমের কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।

লোকটি বলল, 'উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, ‘না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

উমার (রাঃ) বললেন, ‘সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيْ غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

‘‘উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমন্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

বোন বললেন, ‘তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে পাঠ করলেন :

طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى (3) تَنْزِيْلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلٰى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى (7) اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (8) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى (9) إِذْ رَأٰى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى (13) إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيْ (14) (سورة طه 1-14)

“১. ত্ব-হা-। ২. তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। ৩. বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে ভয় করে (আল্লাহকে)। ৪. যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে তা নাযিল হয়েছে। ৫. ‘আরশে দয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬. যা আকাশে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দু’য়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে সব তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। ১১. তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, ‘হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার ‘ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর’।’ (ত্ব-হা ২০ : ১-১৪)

বললেন, ‘এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সন্ধান বল।’

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।’

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?’

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, ‘উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।’

হামযাহ বললেন, ‘ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أَمَا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتَّى يَنْزِلَ اللهُ بِكَ مِنْ الْخَزِى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ؟)

‘‘উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?’

তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর সমীপে দু‘আ করলেন,

اللهم هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللهم أَعِزِّ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

‘‘হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।’ নাবী (সাঃ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।’

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। আরব মুলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক্ব নিজ সূত্রের বরাতে উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত

করেছেন যে, 'যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবূ জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষণাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, 'কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?' প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, 'তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন।

ইমাম ইবনে জাওযী উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যেত তখনই লোক তার পিছু ধাওয়া করত এবং তাকে মারধর করত। সেও তাদের পাল্টা মারধর করত। এ জন্য যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন আমার মামা আসী বিন হাশিমের নিকটে গেলাম এবং তাঁকে আমার মুসলিম হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কুরাইশের একজন বড় প্রধানের বাড়িতে গেলাম (সম্ভবতঃ আবূ জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করলাম কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমার বলেন, যখন 'উমার (রাঃ) মুসলমান হলেন তখন তিনি বললেন কে এমন আছে যে কোন কথাকে খুব প্রচার কিংবা ঢোল শোহরত করতে পারে? লোকেরা বলল, জামীল বিন মা'মার জুমাহী। একথা শোনার পর তিনিস জামীল বিন মা'মার জুমাহীর নিকট গেলেন, আমি তার সাথেই ছিলাম। 'উমার তাকে বললেন যে, তিনি মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর শপথ এ কথা শোনামাত্র অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল যে, খাত্তাবের পুত্র উমার বেদ্বীন

হয়ে গিয়েছে। উমার তাঁর পিছনেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, 'এ মিথ্যা বলছে। আমি বেদ্বীন হই নি বরং মুসলিম হয়েছি।'

যাহোক, লোকজনেরা তাঁর উপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে উমার; মারপিট চলতে থাকল। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সেই অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। উমার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমার বললেন, 'যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিন শত হতাম তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা করতাম তা দেখাদেখি হয়ে যেত।

এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও ক্রোধান্বিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং উমার (রাঃ)-এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহুল বুখারীর মধ্যে ইবনে উমার হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, উমার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় আবূ 'আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আগমন করল। সে ইয়ামান দেশের তৈরী নকশাদার জোড়া চাদর এবং রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সাথে এবং জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি এবং এ জন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

আস বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

আসের এ কথা শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম, কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করলাম।

তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমগ্র উপত্যকা গিজ গিজ করছিল।

আমজনতার অগ্রভাগে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোথায় চলেছ?'

উত্তরে তারা বলল, 'আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলের একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। কারণ, সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।'

আস বলল, 'না সে দিকে যাবার কোন পথ নেই।'

এ কথা শুনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে তাদের পূর্বের স্থান অভিমুখে ফিরে গেল।

উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে অাঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী কারণে লকব বা উপাধি 'ফারূক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার তিনদিন পূর্বে হামযাহ (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম হলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?

নাবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'অবশ্যই! সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।'

উমারের বর্ণনা : 'তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দু'টি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরোভাগে ছিলেন হামযাহ (রাঃ) আর অন্য সারির শিরোভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় যাঁতার আটার মতো হালকা ধূলি কণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

উমার (রাঃ) বলেছেন, ‘কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাহকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তারা এত আঘাতপ্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উপাধি দিয়েছিলেন ‘ফারূক’’[

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত উমার (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা ক্বাবা’হগৃহের নিকট নামায আদায় করতে সাহস করিনি।

সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহবান জানানো সম্ভব হল।

পূর্বের সূত্র ধরেই বলা হয়েছে, ‘আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করলাম। যারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করলাম।

ইবনে মাসউদের বর্ণনাঃ ‘যখন হতে উমার (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।’

কুরাইশ প্রতিনিধি

দু’জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পাশবিকতা ও মাতলামির স্থলে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাঁর প্রচার এবং তাবলীগের কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার

জন্য কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে সদাচার করা এবং অর্থ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব, নারী ইত্যাদি যোগান দেয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁকে প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত করার এক নয়া কৌশল প্রয়োগের মনস্থ করে। কিন্তু সেই হতভাগ্যদের জানা ছিল না যে, সমগ্র পৃথিবী যার উপর সূর্য উদিত হয় দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় খড় কুটারও মর্যাদা বহন করে না। এ কারণে এ পরিকল্পনায়ও তাদের অকৃতকার্য ও বিফল হতে হয়।

ইবনে ইসহাক্ব ইয়াযিদ বিন যিয়াদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন ক্বা'ব কুরাযীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে বলা হয় যে, উতবাহ বিন রাবী'আহ যিনি গোত্রীয় প্রধান ছিলেন, একদিন কুরাইশগণের বৈঠকে বললেন- 'ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদুল হারামের এক জায়গায় একাকী অবস্থান করছিলেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে কেনই বা কথোপকথন করব না এবং তাঁর সামনে কিছু উপস্থাপন করব না। হতে পারে যে, তিনি আমাদের কোন কিছু গ্রহণ করে নিবেন। তবে যা কিছু তিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে তা প্রদান করে আমরা তাঁকে তাঁর প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত করে দেব।' এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন হামযাহ মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুশরিকগণ দেখছিল যে, মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুশরিকগণ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি যান এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন। এরপর উতবাহ সেখান থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বসল এবং বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের গোত্রে তোমার মর্যাদা ও স্থান যা আছে এবং বংশীয় যে সম্মান আছে তা তোমার জানা আছে। এখন তুমি নিজ গোত্রের নিকট এক বড় ধরণের ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে গোত্রভুক্ত বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ওদের বিবেক-বুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন করে ফেলেছ। তাদের উপাস্য প্রতিমাদের এবং তাদের ধর্মের দোষত্রুটি প্রকাশ করে মৃত পূর্ব পুরুষদের 'কাফের' সাব্যস্ত করছ। এ সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা পেশ করছি। তার প্রতি মনোযোগী হও। এমনটি হয়তো বা হতেও পারে যে, কোন কথা তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করবে।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আবুল ওয়ালীদ বল আমি তোমার কথায় মনোযোগী হব।’

আবুল ওয়ালীদ বলল, ‘ভ্রাতুষ্পুত্র! এ ব্যাপারে তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের সব চাইতে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পন করে দিব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না, কিংবা যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না, তাহলে আমার তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরাই তা করতে প্রস্তুত আছি, কেননা কখনো কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এ জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনও হয়ে দাঁড়ায়।

উতবাহ এক নাগাড়ে এ সব কথা বলতে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা বলা শেষ করল তখন নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, ‘আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? সে বলল, ‘হ্যাঁ’

নাবী (সাঃ) বললেন, ‘বেশ ভাল, এখন আমার কথা শোন।’

সে বলল, ‘ঠিক আছে শুনব।’

নাবী (সাঃ) বললেন,

(بسم الله الرحمن الرحيم حٰم تَنزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ) [فصلت:1: 5].

অর্থঃ হা'মীম, এ বাণী করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর তরফ থেকে নাজিলকৃ, এটা এমন একটি কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন যা আরবী ভাষায় (অবতারিত), জ্ঞানী লোকদের জন্য (উপকারী)। (এটা) সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কিন্তু অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা শুনেই না। এবং তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাদের ডাকেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত। (ফুসসিলাত ৪১ : ১-৫)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠ করতে থাকেন এবং উতবাহ নিজ দু'হাত পশ্চাতে মাটির উপর রাখা অবস্থায় তাতে ভর দিয়ে শ্রবণ করতে থাকে। যখন নাবী (সাঃ) সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছে গেলেন। তখন সিজদা করলেন এবং বললেন, আবুল ওয়ালীদ তোমাকে যা শ্রবণ করানোর প্রয়োজন ছিল তা শ্রবণ করেছ, এখন তুমি জান এবং তোমার কর্ম জানে।

উতবাহ সেখান থেকে উঠে সোজা তার বন্ধুদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখে মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আল্লাহর শপথ! আবুল ওয়ালীদ তোমাদের নিকট সেই মুখ দিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়েছিল, তারপর আবুল ওয়ালিদ যখন তাদের নিকট এসে বসল তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবুল ওয়ালীদ! পিছনের খবর কি?'

সে বলল, 'পিছনের খবর হচ্ছে আমি এমন এক কথা শুনেছি যা কোনদিনই শুনি নি। আল্লাহর শপথ! সে কথা কবিতা নয়, যাদুও নয়। হে কুরাইশগণ! আমরা কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। (আমার মত হচ্ছে) ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থেকে যাক। আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শ্রবণ করলাম তা দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবী হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি আরবীদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহলে এর রাজত্ব পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হিসেবে গণ্য হবে! এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সব চাইতে বেশী তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

লোকেরা বলল, ‘আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম, তোমার উপরও তার যাদুর প্রভাব কাজ করেছে।’

উতবাহ বলল, ‘তোমরা যাই মনে করনা কেন, তাঁর সম্পর্কে আমার যা অভিমত আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। এখন তোমরা যা ভাল মনে করবে, তাই করবে।

অন্য এক বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) যখন তিলাওয়াত আরম্ভ করেছিলেন তখন উতবাহ নীরবে শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেন,

(فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ) [فصلت:13

‘‘এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- আমি তোমাদেরকে অকস্মাৎ শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি- ‘আদ ও সামূদের (উপর নেমে আসা) অকস্মাৎ-শাস্তির মত।’ (ফুসসিলাত ৪১ : ১৩)

এ কথা শোন মাত্রই উতবাহ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবং এটা বলে তার হাত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখের উপর রাখল যে, আমি আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে এবং আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে কথা বলছি যে, এমনটি যেন না করা হয়। সে এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শিত ভয় যদি এসেই যায়। এরপর সে সমবেত মুশরিকগণের নিকট চলে যায় এবং তাদের সঙ্গে উল্লেখিত আলাপ আলোচনা করে।

বয়কটের ঘটনাক্রম

অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গীকার:

মুশরিকদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো এবং তারা দেখতে পেল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফির সকলের সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেছে। এ সব কারণে মুশরিকদের হতবুদ্ধিতা আরো বেড়ে গেল।

পূর্বোলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুশরিকগণ 'মুহাসসাব' নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানাহর ভিতরে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকগণ এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তারা কখনো বনু হাশিমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার জন্য মুশরিকগণের হাতে সমর্পন না করবে সে পর্যন্ত এ অঙ্গীকার নামা বলবৎ থাকবে।

ইবনে কাইয়ূমের বর্ণনা সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকারপত্রখানা লিখেছিলেন মানসুর বিন ইকরামা বিন 'আমির বিন হাশিম। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেনে যে, এ অঙ্গীকার নামা লিখেছিলেন নাযর বিন হারিস। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এ অঙ্গীকার নামার সঠিক লেখক ছিলেন বোগায়েয বিন 'আমির বিন হাশিম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি বদ দোওয়া করেছিলেন যার ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক এ অঙ্গীকার স্থিরীকৃত হল এবং অঙ্গীকারনামাটি ক্বাবা'হর দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবূ লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের কী কাফের, কী মুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শেয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়ত সপ্তম বর্ষের মুহারম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে। তবে এ ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যাপারে আরো মতামত রয়েছে।

এ বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। উপবাসের অবস্থা এরূপ হয়ে যখন মর্মবিদারক কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকত তখন গিরি সংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব পড়েছিল, যা পৌঁছত তাও অতি সঙ্গোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করত তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সে সব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিত যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেত।

খাদীজাহ (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। এক দিবস আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বোখতারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল এবং তার ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এ দিকে আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কিত সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন। তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যথেকে এক জনকে রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার পরিত্যাজ্য শয্যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজ্বের সময় নাবী কারীম (সাঃ) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ গিরি সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং হজ্বব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সে সময় আবূ লাহাবের কার্যকলাপ যা ছিল সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বয়কটের অঙ্গীকার বিনষ্ট

এরূপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ দু' বা তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুওয়াত ১০ম বর্ষের মুহাররম মাসে লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তিত ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ, প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক ছিল এর বিপক্ষে। যারা এর বিপক্ষে ছিল তারা সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকত একে বাতিল কিংবা বিনষ্ট করার জন্য। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সেই একরারনামা বিনষ্ট করার মোক্ষম এক সুযোগ এসে যায় অবলীলাক্রমে।

এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন বনু 'আমির বিন লুঈ গোত্রের হিশাম বিন 'আমর নামক এক ব্যক্তি। রাতের অন্ধকারে এ ব্যক্তি গোপনে গোপনে 'শেয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরি সংকটের ভিতরে খাদ্য শস্যাদি প্রেরণ করে বনু হাশিমের লোকজনদের সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এ ব্যক্তি এক দিন যুহাইর বিন আবূ উমাইয়া মাখযুমীর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। যুহায়েরের মাতা আতেকা হলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং আবূ ত্বালীবের ভগ্নী। তিনি যুহাইরকে সম্বোধণ করে বললেন, যুহাইর! 'তুমি এটা কিভাবে বরদাস্ত করছ যে, আমরা উদর পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করছি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করছি আর বনু হাশিম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছে। বর্তমানে তোমার মামা বংশের যে অবস্থা চলছে তা তুমি ভালভাবেই

জানো।' বনু হালীমাহর কথা শুনে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে যুহাইর বললেন, 'সব কথাই তো ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে একা আমি কী করতে পারি? তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহলে অবশ্যই আমি এ একরারনামা ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম''। হিশাম বলল, 'বেশতো, এ ব্যাপারে আমি আছি তোমার সঙ্গে।' যুহাইর বলল, বেশ, তাহলে এখন তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।'

এ প্রেক্ষিতে হিশাম, মুত্ব'ঈম বিন আদীর নিকটে গেলেন। মুত্ব'ঈম বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সম্পর্ক সূত্রে আবদে মানাফের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিশাম তাঁদের বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ভৎর্সনা করার পর 'বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের দারুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'বংশীয় ব্যক্তিদের এত দুঃখ, কষ্টের কথা অবগত হওয়া সত্ত্বও তুমি কিভাবে কুরাইশদের সমর্থন করতে পার?' মুত্ব'ঈম বললেন, 'সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি একা কী করতে পারি? 'হিশাম বললেন, 'আরও একজন রয়েছে।' মুত্ব'ঈম জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? হিশাম বললেন, 'আমি''। মুত্ব'ঈম বললেন, 'আচ্ছা তবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো'। হিশাম বললেন, 'এটাও করেছি।' বললেন, সে কে? উত্তরে বললেন, 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।'

মুত্ব'ঈম বললেন, 'আচ্ছা তবে এখন চতুর্থ ব্যক্তির অনুসন্ধান করো''। এ প্রেক্ষিতে হিশাম বিন 'আমর আবুল বুখতারী বিন হিশামের নিকট গেলেন এবং মুতয়েমের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গেও ঠিক একইভাবে কথাবার্তা হল।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা এর সমর্থক কেউ আছে কি?' হিশাম বললেন হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে? হিশাম বললেন, 'যুহাইর বিন আবি উমাইয়া, মুত্ব'ঈম বিন আদী এবং আমি।'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন ৫ম ব্যক্তির খোঁজ করো। এবাবে হিশাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে

কথাবার্তা বলেন বনু হাশিমের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রাপ্যসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা যে কাজের জন্য আমাকে ডাক দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আরও কি কারো সমর্থন আছে?

হিশাম 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর করে সকলের নাম বললেন। তারপর তাঁরা সকলে হাজূনের নিকট একত্রিত হয়ে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, কুরাইশগণের অঙ্গীকারপত্রখানা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যুহাইর বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিই সর্ব প্রথম মুখ খুলব।'

পূর্বের কথা মতো পর দিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহাইর শরীরে একজোড়া কাপড় ভালভাবে লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করে নিলেন। তারপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মক্কাবাসীগণ! আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খাওয়া-দাওয়া করব, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করব। আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না, যতক্ষণ ঐ অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক অঙ্গীকারপত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা না হচ্ছে।

আবূ জাহল মাসজিদুল হারামের নিকটেই ছিল- সে বললো, তুমি ভুল বলছ। আল্লাহর শপথ! তা ছিঁড়ে ফেলা হবে না।

প্রত্যুত্তরে যাময়া বিন আসওয়াদ বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! তুমি অধিক ভুল বলছ। কিসের অঙ্গীকারপত্র! ওটা লিখার ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। আমরা ওতে সন্তুষ্টও ছিলাম না।''

অন্য দিক থেকে আবুল বুখতারী সহযোগী হয়ে বলে উঠল,

''যাময়া ঠিকই বলেছো। ঐ অঙ্গীকারপত্রে যা লেখা হয়েছিল তাতে আমাদের সম্মতি ছিল না এবং এখনো তা মান্য করতে আমরা বাধ্য নই।'

এর পর মুত্ব'ঈম বিন আদী বললেন, 'তোমরা উভয়েই ন্যায্য কথা বলেছো। এর বিপরীত কথাবার্তা যারা বলেছো তারাই ভুল বলেছো। আমরা এ প্রতিজ্ঞাপত্র এবং ওতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা হতে আল্লাহর সমীপে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

ওদের সমর্থনে হিশাম বিন 'আমরও অনুরূপ কথাবার্তা বললেন।

এদের আলাপ ও কথাবার্তা শুনে আবূ জাহল বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এ সব কথা আলাপ-আলোচনা করে বিগত রাত্রিতে স্থির করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ এ স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র কোথাও করা হয়েছে।'

ঐ সময় আবূ ত্বালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ অঙ্গীকারপত্র সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক এবং আত্মীয়তা বিনষ্টকারী অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর চাচা আবূ ত্বালিবকে এ কথা বলেছিলেন এবং তিনিও কুরাইশগণকে এ কথা বলার জন্য মসজিদুল হারামে আগমন করেছিলেন।

আবূ ত্বালিব কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের অঙ্গীকারপত্রটির সমস্ত লেখা আল্লাহ প্রেরিত কীটেরা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু আল্লাহর নামটি বর্তমান আছে। এ সংবাদটি আপনাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ও আপনাদের মধ্য থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করবেন। কিন্তু তাঁর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছেন তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথায় কুরাইশগণ বললেন, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলছেন।'

এ দিকে আবূ জাহল এবং লোকজনদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও বচসা শেষ হলে মুত্ব'ঈম বিন আদী অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে, এক প্রকার কীট লেখাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু মাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল শুধু সেই লেখা গুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি।

তারপর অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা হল এবং এর ফলে বয়কটেরও অবসান ঘটল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যান্য সকলে শেয়াবে আবূ ত্বালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুশরিকগণ নাবী (সাঃ)-এর নবুওয়তের এক বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন সূচিত হল না। যার উল্লেখ এ আয়াতে কারীমায় রয়েছে,

(وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) [القمر:2]

"কিন্তু তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে- 'এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু'।' (আল-ক্বামার ৫৪ : ২)

তাই মুশরিকগণ বিমুখ হলে গেল এবং স্বীয় কুফরে তারা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেল।

ইয়াওমুল হুজন/শোকের বছর

আবু ত্বলিবের মৃত্যু:

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবূ ত্বালীবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীর বুখারীতে মুসাইইব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,

(أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)

‘চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইলালাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।’’

আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, ‘আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।’ নাবী কারীম (সাঃ) বললেন,

(لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْـهُ)

‘‘আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।’ এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِي قُرْبٰى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) [التوبة:113]

‘‘নাবী ও মু’মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।’ (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয়:

(إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص: 56]

‘‘তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।’ (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের

আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নাবী (সাঃ) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? 'কারণ নাবী কারীম (সাঃ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ বললেন,

(هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِن نَّارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ)

"তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতল ডুবে যেতেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবূ ত্বালীবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁট পৌঁছবে।

খাদিজা (রা) এর চিরবিদায়:

আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মো'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনে খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাবী (সাঃ)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও

জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাবী কারীম (সাঃ) বলেছেন,

(آمَنَتْ بِيْ حِيْنَ كَفَرَ بِيْ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِيْ حِيْنَ كَذَّبَنِيْ النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِيْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَّمَنِيْ النَّاسُ، وَرَزَقَنِيْ اللهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا)

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে দান করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, ‘হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ (রাঃ) আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ ত্বালীবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মো’মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মুত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নাবী (সাঃ)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের

মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী (সাঃ) ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একেত প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা নির্যাতন পর্বতসম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নাবী (সাঃ)-এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আরও পরে)।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নয়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবূ বাকর (রাঃ) -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ‘বারকে গিমাদ’ নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনে দাগানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।[1]

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এত কষ্ট দেন যা আবূ ত্বালীবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের

পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন,

(لَا تَبْكِىْ يَابُنَيَّةُ، فَإِنَّ اللهَ مَانِعٌ أَبَاكَ)

''পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।''

ঐ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে,

(مَا نَالَتْ مِنِّىْ قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتّٰى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ)

''যতদিন আমার চাচা আবূ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।''

এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নাবী কারীম (সাঃ) সেই বছরটির নাম রাখেন 'আমুল হুযন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

রাসুল ﷺএর সাথে সাওদাহ (রা) এর বিবাহ

নবুওয়ত ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। এ মহিলা নবুওয়তের প্রথম অবস্থাতেই মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশের (আবিসিনিয়ায়) দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদাহ তাঁর সঙ্গে হাবশা হিজরত করেছিলেন। সাওদাহর স্বামী হাবশে মৃত্যুবরণ করেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈধব্যের পর ইদ্দত পালন শেষ হলে নাবী কারীম (সাঃ) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তারপর তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজাহ (রাঃ)-এর পর এ মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম স্ত্রী (বিবাহ পরম্পরায়) দ্বিতীয় স্ত্রী) কয়েক বছর পর ইনি নিজের পালা আয়িশাহ (রাঃ)-কে দান করে দিয়েছিলেন।

মক্কার বাইরে দাওয়াত প্রদান

তায়েফের পথে রাসুল ﷺ :

নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের শেষের দিকে কিংবা জুন মাসের প্রথম দিকে) নাবী কারীম (সাঃ) ত্বায়িফ গমন করেছিলেন। ত্বায়িফ মক্কা থেকে আনুমানিক ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাতায়াতের এ দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ)। পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে কাবিলাহ বা গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এ আহবানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয় নি।

ত্বায়িফ গমন করে সাক্বীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে, যারা সকলেই সহোদর ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নাম ছিল যথাক্রমে আবদে ইয়ালাইল, মাসউদ ও হাবীব। ভ্রাতৃত্রয়ের পিতার নাম ছিল ‘আমর বিন ওমাইর সাক্বাফী। তাঁদের সঙ্গে (সাক্ষাতের পর মহানাবী (সাঃ) আল্লাহ তা‘আলার অনুগত হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বলেন যে, সে কাবার পর্দা (আবরণ) ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন।[2] দ্বিতীয়জন বললেন, ‘নাবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি? তৃতীয়জন বললেন, ‘তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নাবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।’ তাঁদের এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং সেখান থেকে যাবার প্রাক্কালে শুধু বললেন, ‘তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখ।’

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্বায়িফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই ‘তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।’ ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান

থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দু'পাশ ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল।

ত্বায়িফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়দ বিন হারিসাহই তাঁকে (সাঃ) রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পথ চলতে থাকেন এবং দুরাচার ত্বায়িফবাসীগণ তাদের এ অত্যাচার অব্যাহত রাখে। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত রুধিরাক্ত কলেবরে পথ চলতে গিয়ে নাবী কারীম (সাঃ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবী'আহর পুত্র উতবাহ ও শায়বাহর। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দূরাচার ত্বায়িফবাসীগণ গৃহাভিমুখে ফিরে যায়।

এ বাগানটি ত্বায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাবী কারীম (সাঃ) আঙ্গুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নাবী কারীম (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এ দু'আ 'দুর্বলদের দু'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দু'আর এক একটি কথা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ত্বায়িফবাসীগণের দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু'আ করলেন,

(اللهم إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِىْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّيْ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِىْ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِيْ، وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيْ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوْذُ بِنُوْرِ

وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمَات، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنَزِّلَ بِيْ غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلُّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ).

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু,তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই”।

এ দিকে রাবী’আহর পুত্রগণ যখন মহানাবী (সাঃ)-কে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত অবস্থায় দেখতে পেল তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। আদাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসের হাতে এক গোছা আঙ্গুর তারা নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই ক্রীতদাসটি যখন আঙ্গুলের গোছাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে তুলে দিতে চাইল তিনি তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন।

আদাস বলল, ‘এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কী?

সে বলল, ‘আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং নিনওয়ার বাসিন্দা।’

নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, ‘ভাল, তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তার গ্রামে তুমি বাস কর, তাই না?

সে বলল, ‘আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কিভাবে চিনলেন?’

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নাবী ছিলেন এবং আমিও নাবী''। এ কথা শুনে আদাস নাবী কারীম (সাঃ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।

এ ব্যাপারে দেখে রাবী'আহ পুত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখ, দেখ, ঐ ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়িয়ে দিল।'

এর পর আদাস যখন তাদের নিকট ফিরে গেল তখন ভ্রাতৃদ্বয় তাকে বলল, 'বলত দেখি ব্যাপারটি কী? ঐ ভদ্রলোক দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিল।'

সে বলল, 'হে আমার মনিব! এ ধরাধামে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউই নেই। তিনি আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা নাবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানে না।'

তারা দুজন বলল, 'দেখ আদ্দাস, ঐ ব্যক্তি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।'

কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাগান থেকে বের হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তার মিশনের বিফলতাজনিত চিন্তা ও দৈহিক যন্ত্রনার দাপটে হৃদয় মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বিশ্রান্ত। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি যখন 'কারনে মানাযেল' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ রাববুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল (আঃ) সেখানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতামন্ডলী। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নাবী (সাঃ) যদি ইচ্ছা করেন তা হলে তারা দু'পাহাড়কে একত্রিত করে দূরাচার মক্কাবাসীকে পিশে মারবেন।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফে আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জীবনে কি এমন কোনদিন এসেছে যা উহুদের দিন চাইতেও কঠিন ছিল?

তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ'', তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে কঠিন ছিল ঐ দিনটি যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম, যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালাইল বিন আবদে কুলালের

পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুশ্চিন্তা ও ব্যথায় পরিশ্রান্ত হয়ে আমি নিজ পথে গমন করি। এভাবে চলতে চলতে 'কারনে সায়ালেবে' যখন এসে পৌঁছি তখন আমার চেতনা ফিরে আসে।

এ সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তিবোধের সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে; ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরাঈল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের কে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফিরিশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! কথা এটাই, আপনি যদি চান যে এদেরকে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে।[3] নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না।[4]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ উত্তরে তাঁর অসাধারণ মানবত্ব প্রেমে সমুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমাশীল অনুপম চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাত আসমানের উপর হতে আগত এই গায়েবী মদদের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরিশতাগণ যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে তিনি সুস্থির চিত্তে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন। এভাবে তাঁর মানসাকাশ থেকে চিন্তা ভাবনার মেঘ দূরীভূত হয়ে যায়।

তারপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে ওয়াদীয়ে নাখলায় অবস্থান করেন। এখানে দুটো জায়গা বসবাসের উপযোগী ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আসসাইলুল কবীর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যায়মা। কেননা, সেখানে পানি ছিল কিছুটা সহজলভ্য এবং জায়গা

দুটো ছিল শস্য শ্যামল। কিন্তু তিনি (সাঃ) এ দুটো জায়গার মধ্যে কোথায় অবস্থান করেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ওয়াদী নাখলায় তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট জিনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের দুটো জায়গায় এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরাহ আল-আহক্বাফে এবং অন্যটি সূরাহ জিনে। সূরাহ আহক্বাফের আয়াতগুলো হচ্ছে,

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِم مُّنذِرِيْنَ قَالُوْا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ) [الأحقاف:29: 31]

"স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০. (ফিরে গিয়ে) তারা বলল- হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন।' (আল-আহক্বাফ ৪৬ : ২৯-৩১)

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُوْلَ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيْداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِيْ أَشَرٌّ

أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) [الجن: 1: 15].

‘১. বল, ‘আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে তারপর তারা বলেছে ‘আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি ২. যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। ৩. আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। ৪. আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত। ৫. আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না। ৬. কতিপয় মানুষ কিছু জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। ৭. (জ্বিনেরা বলেছিল) তোমরা (জ্বিনেরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষেরা ধারণা করত যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। ৮. আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ। ৯. আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে। ১০. আমরা জানি না (এই পরিবর্তিত অবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীবাসীর অকল্যাণই চাওয়া হচ্ছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাতে চান। ১১. আর আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল, আর কতিপয় এমন নয়, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। ১২. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না। ১৩. আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর ঈমান

আনে তার কোন ক্ষতি বা যুল্মের ভয় থাকবে না। ১৪. আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহর প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। ১৫. আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।' (আল-জিন ৭২ : ১-১৫)

এ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এ আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানাবী (সাঃ) জিনদের আগমনের কথা জানতেন না। আল্লাহ রাববুল আলামীন এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে জিনদের আগমনের কথা অবহিত করেন এবং তখন তিনি তা জানতে পারেন। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এটাই ছিল জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, এর পর থেকে নাবী কারীম (সাঃ)-এর দরবারে তাদের গমনাগমন চলতে থাকে।

জিনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দ্বিতীয় সাহায্যমূলক ঘটনা যে সাহায্য তিনি করেছিলেন তাঁর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই অবগতি ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাতে নাবী কারীম (সাঃ)-এর দাওয়াতের কামিয়াবির সুসংবাদ রয়েছে। অধিকন্তু, এটাও পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্বের কোন শক্তি তাঁর দাওয়াতের কার্যকারিতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। অতএব ইরশাদ হয়েছে,

(وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُوْنِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [الأحقاف:32]،

''আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।' (আল-আহক্বাফ ৪৬ : ৩২)

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا) [الجن:12].

‘‘আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।’ (আল-জিন ৭২: ১২)

এ সাহায্য ও সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর যত প্রকারের চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এবং নৈরাশ্য, ত্বায়িফবাসীদের গালি-গালাজ, চাটিমারা ও প্রস্তর নিক্ষেপের কালো মেঘ সব কিছুই মন থেকে মুছে গেল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতেই হবে এবং নতুনভাবে ইসলামের দাওয়াত ও নবুওয়াতের তাবলীগ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করতে হবে। এটা ছিল ঐ সময়ের কথা যখন যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, ‘মক্কাবাসীগণ অর্থাৎ কুরাইশগণ যে অবস্থায় আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে অবস্থায় কিভাবে আপনি মক্কা প্রত্যাবর্তন করবেন?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘হে যায়দ! তুমি যে অবস্থা দেখছ এর একটা সুরাহা অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই এ থেকে পরিত্রাণের একটি পথ বের করে দেবেন। তাঁর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং নিজ নাবী (সাঃ)-কে জয়ী করবেন।

নাবী কারীম (সাঃ) শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করলেন। তারপর খুযা’আহ গোত্রের একজন লোক মারফত আখনাস বিন শারীক্বের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে তিনি যেন নাবী কারীম (সাঃ)-কে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু আখনাস এই বলে আপত্তি করলেন যে, কুরাইশরা হচ্ছেন তাঁর মিত্র। কাজেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আশ্রয় প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর তিনি সুহায়েল বিন ‘আমর এর নিকট ঐ একই অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলে আপত্তি জানালেন যে, বণী আমেরের আশ্রয় দেয়া বনু কা’বের জন্য (সঙ্গত) হয় না। অতঃপর নাবী সাঃ মুত্ব’ঈম বিন আদির নিকট বার্তা প্রেরণ করলেন। মুত্ব’ঈম বললেন, হাঁ, অতঃপর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজ পুত্রগণ এবং সম্প্রদায়কে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ক্বাবা’হ ঘরের নিকটে একত্রিত হয়ে যাও, কেননা আমি মুহাম্মাদ সাঃ-কে আশ্রয় দিয়ে দিয়েছি। অতঃপর

মুত্বঈম নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট খবর পাঠালেন মক্কায় আগমনের জন্য। তিনি খবর পেয়ে যায়িদ বিন হারিসাহকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ব'ঈম বিন আদী আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ব'ঈম বিন আদী আপন বাহনের উপর দৌড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আশ্রয় প্রদান করেছি, কেউ যেন তাঁকে আর অনর্থক হয়রান না করে।'

এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সোজা হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা চুম্বন করেন। তারপর দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন এবং অস্ত্রসজ্জিত মুত্ব'ঈম বিন আদী ও তাঁর লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা হয়, এ সময় আবূ জাহল মুত্ব'ঈমকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আশ্রয় দিয়েছ না মুসলিমগণের অনুসারী হয়ে গিয়েছ?' উত্তরে মুত্ব'ঈম বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।' এর উত্তরে আবূ জাহল বলেছিল, 'তুমি যাঁকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিলাম''।[5]

মুত্ব'ঈম বিন আদির সৌজন্য ও সহৃদয়তার কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও ভুলেন নি। যখন বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের একটি দল বন্দী হয়ে আসে এবং কোন বন্দীর মুক্তির জন্য জুবায়ের বিন মুত্ব'ঈম নাবীজী (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করেন তখন তিনি বললেন,

(لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)

অর্থঃ যদি মুত্ব'ঈম বিন আদী জীবিত থাকত এবং এই দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করত তাহলে তাঁর খাতিরে ওদেরকে ছেড়ে দিতাম।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতের দশম বর্ষের যুল ক্বা'দাহ মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের প্রথম ভাগে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্বায়িফ থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় নতুনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করেন। যেহেতু তখন সময়টা ছিল হজ্জ্ব মৌসুমের কাছাকাছি সেহেতু নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনেরা পদব্রজে ও যানবাহনে হজ্জ্ব পালনের জন্য মক্কা শরীফে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। নাবী কারীম (সাঃ) এই সময়টাকে দাওয়াত দানের জন্য বেশ উপযোগী মনে করে এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন যা তিনি নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে করে আসছিলেন। অধিকন্তু তিনি (সাঃ) এই দশম বছর থেকে লোকেদেরকে তাঁকে সাহায্য-সহযোগীতা করা, আশ্রয় কামনার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিসালাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেছেন, নাবী কারীম (সাঃ) যে যে গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তাদের মধ্যে নিম্নের গোত্রগুলোর কথা আমাকে বলা হয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ

বনু 'আমির বিন সা'সাআহ, মহারেব বিন খাসফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, মুররাহ, হানিফাহ, সালীম, আবস, বনু নাসর, বনু বকা, কালব, হারিস বিন কা'ব, আযরাহ ও হাযারেমা। কিন্তু এদের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম যুহরী যে সকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সকলের নিকট একই বছর অথবা একই হজ্জ্বের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়নি। বরং নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে আরম্ভ করে হিজরতের পূর্বের শেষ হজ্জ্ব মৌসুম পর্যন্ত দশ বৎসর সময়ের মধ্যে এ দাওয়াত পেশ করেছিলেন কোন নির্দিষ্ট গোত্রের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এর অধিকাংশ ছিল দশম সনে।

ইবনে ইসহাক্ব কোন কোন গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এবং তাদের উত্তরের অবস্থা, রকম, ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা হলঃ

১. বনু কালবঃ নাবী কারীম (সাঃ) বনু কালব এর একটি শাখা বনু আব্দুল্লাহর নিকটে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সম্মুখে পেশ করেন। আলাপ আলোচনা সূত্রে তিনি তাদের বলেন, 'হে বনু আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তোমাদের উচিত আল্লাহর এ আহবানে সাড়া দেয়া। কিন্তু এ গোত্র তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন নি।

২. বনু হানীফাঃ নাবী কারীম (সাঃ) তাদের তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারা এমন অশ্রাব্য উত্তর প্রদান করে যা আরবের অন্য কেউই প্রদান করেনি।

৩. আমির বিন সা'সা'আহঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ গোত্রের লোকজনদেরও আল্লাহর পথে আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। উত্তরে এ গোত্রের বাইহারাহ বিন ফিরাস নামক একটি লোক বলে যে, 'আল্লাহর কসম! যদি আমি কুরাইশদের এ যুবককে গ্রহণ করি তবে তাঁর দ্বারা সমগ্র আরবকে খেয়ে ফেলব।' আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বলুন, যদি আমরা আপনার নিকট আপনার এ ধর্মের উপর অনুগত্য স্বীকার করি এবং আল্লাহ আপনাকে বিপক্ষবাদীদের উপর জয়ী করেন তবে আপনার পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব কি আমাদের উপর অর্পিত হবে?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'নেতৃত্বের চাবি কাঠিতো আল্লাহর হাতে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি নেতৃত্বের স্তম্ভ স্থাপিত করবেন।'

লোকটি বলল, 'ভাল, আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের বক্ষ আপনার প্রতিপক্ষ আরবদের নিশানায় থাকবে, কিন্তু আল্লাহ যখন আপনাকে জয়ী করবেন তখন কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কারও হাতে থাকবে এটা কখনই হতে পারে না। কাজেই আপনার ধর্মের আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই।' মোট কথা তারা তাঁকে অস্বীকার করল।

এর পর যখন বনু ‘আমির গোত্রের লোকজনেরা নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে এক বৃদ্ধকে যিনি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ্ব গমনে সক্ষম হন নি সমস্ত ঘটনা শুনালো প বলল যে, ‘আমাদের নিকট কুরাইশ খানদানের বনু আব্দুল মুত্তালিবের এক যুবক এসেছিল। তার ধারণা যে, সে আল্লাহর নাবী। সে দাওয়াত দিল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে যেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমাদের অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে আসি।’

এ কথা শ্রবণে বৃদ্ধ লোকটি দু’হাত দিয়ে মাথা ধরে ফেলল এবং বলল, ‘হে বন্ধু ‘আমির! এখন কি এ ভুল সংশোধনের কোন পথ আছে? আর যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার কি অনুসন্ধান করা যেতে পারে? সে সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে উমুকের প্রাণ আছে ইসমাঈল (আঃ)-এর গোত্রের কারও পক্ষে এ (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবী করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই সত্য নাবী। তোমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল?

আয়িশা রা এর সাথে বিবাহ

এ বছরই অর্থাৎ একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে মনোনীত নয় বছর বয়সে উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ (রাঃ) স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।[1] (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয়তম সাহাবী আবূ বাকর (রাঃ)-এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ অসম বিবাহের।)

উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ

নাবী কারীম (সাঃ)-এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। সুদূর আকাশের প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলো এবং ধূলিযুক্ত ঝলক দৃষ্টি গোচর হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ ভ্রমণ ও

উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি'রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

মি'রাজের এ বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি কোন্ সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল সে বছর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (এটা তাবারীর কথা)।

২. নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (ইমাম নাবাবী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেছেন)।

৩. দশম নবুওয়াত বর্ষের ২৭শে রজব তারীখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। (আল্লামা মানসুরপুরী এ মত গ্রহণ করেছেন)।

৪. হিজরতের ষোল মাস পূর্বে, অর্থাৎ নবুওয়াত দ্বাদশ বর্ষের রমযান মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের মুহারম মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৬. হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি মত এ জন্য সহীহুল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না যে, উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে। কাজেই, এ থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল মি'রাজের পূর্বে। তাছাড়া, এটাও সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দশম নবুওয়াত বর্ষের রমাযান মাসে। এ প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মি'রাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়।

অবশিষ্ট থাকে শেষের তিনটি মত। এ তিনটির কোনটিকেই কোনটির উপর অগ্রাধিকার দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সূরাহ 'ইসরার' বর্ণনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কা জীবনের শেষ সময়ে।

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত রিওয়ায়াত প্রদান করেছেন পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলোতে তার সার সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হল :

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল (আঃ) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নাবীগণ (আঃ)-এর জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম আসমানের দরজা খোলা হল সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জিবরাঈল (আঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন আপনার আদি পিতা আদম (আঃ)। একে সালাম করুন। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শ্রদ্ধাভারে সালাম জানান। আদম (আঃ) আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'খোশ আমদেদ!' হে বংশের মধ্যমণি! খোশ আমদেদ! হে আমার বংশের গৌরব!' তারপর তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মাসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (আঃ)-কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান (আঃ)-কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মুসা বিন ইমরান (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মুসা (আঃ) সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নাবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেন।''

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে, তিনি (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্ভ্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। তথাকার কূল বৃক্ষের এক একটা ফল 'হাজার' অঞ্চলের কুল্লাহ'র ন্যায়। আর তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রং আচ্ছন্ন

করে ফেলল। ফলে তা এমন রুপে পরিবর্তিত হলো যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বায়তুল মা'মূর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে না। এরপর তিনি (সাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে মোতি নির্মিত রশি, জান্নাতের মাটি হলো মেশক নামক সুগন্ধির তৈরী। অতঃপর তাঁর নিকট এমন বিষয় পেশ করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান।

তারপর এ বিশ্বের মহা গৌরব, চির আকাঙ্ক্ষিত মানব নাবী, দোজাহানের মহাসম্মানিত সম্রাট, তাজদারে মদীনা, নাবীকুল শিরোমণি, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন্নাবিয়ীন নীত হলেন অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর, অসীম শক্তি-সামর্থ্য ও হিকমতের মালিক আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। পর্দার একপাশে চির বিশ্ব জাহানের চির আরাধ্য, চির উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভূ, অন্যপাশে তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তম নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ), মধ্যখানে রয়েছে দু'ধনুকের জ্যার সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চাইতেও কম। অনুষ্ঠিত হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, অশ্রুত পূর্ব সম্মেলন। অত্যন্ত প্রতাপান্বিত স্রষ্টা প্রভূ এবং মনোনীত প্রিয়তম সৃষ্টির মধ্যে হল আল্লাহর বাণী বিনিময়। তোহফা স্বরূপ বরাদ্দ করা হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাত।

এরপর শুরু হল নাবীজী (সাঃ)-এর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তনের পালা। এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হল মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে। উত্তরে নাবী কারীম (সাঃ) বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের কথা।

উত্তরে মুসা (আঃ) বললেন, 'আপনার উম্মতের পক্ষে সম্ভব হবে না পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের উপর আরোপিত এ গুরু দায়িত্ব হালকা করে নেয়ার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন পেশ করুন।

এ কথা শ্রবণের পর জিবরাঈল (আঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জিবরাঈল (আঃ) ইঙ্গিতে বুঝালেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে মহাপরাক্রশালী আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে গেলেন, তিনি নিজ স্থানেই ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় সহীহুল বুখারীতে এ কথা আছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নীচে আনা হল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুসা (আঃ)-এর নিকট আগমন করে দশওয়াক্ত কমানোর কথা বললেন, তখন তিনি পুনরায় পরামর্শ দিলেন আল্লাহর সমীপে ফিরে গিয়ে এ গুরুভার আরও লাঘব করার জন্য আরও আবেদন পেশ করতে। শেষমেষ পাঁচওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত মুসা (আঃ) এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'মঞ্জিলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যাতায়াত অব্যাহত থাকল। শেষ দফায় যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়া হল তখনো মুসা (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরও কিছুটা হালকা করে নেয়ার জন্য। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুনরায় যেতে আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি। অত্যন্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে আমি দিন ও রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম।' এ বলে তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন তিনি বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করলেন তখন নিম্নোক্ত কথাগুলো তাঁর শ্রুতিগোচর হল।'আমি আমার বান্দাদের জন্য আপন ফরজ জারী করে দিলাম এবং বান্দাদের দায়িত্বভার কিছুটা হালকা করে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন প্রভূকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে ইবতুল কাইয়্যেম মতভেদ বর্ণনা করেছেন। এরপর ইবনে তাইমিয়ার এক সূক্ষ্ম বর্ণনার আলোচনা করেছেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে 'আল্লাহকে চাক্ষুস দেখার কোন প্রমাণ নেই।' কোন সাহাবীও এরকম কোন কথা বলেন নি। আর ইবনে আব্বাস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখার এবং অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার যে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে প্রথতুটি দ্বিতীয়টির বিপরীত নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, সূরাহ নাজমে আল্লাহ তা'আলার যে ইরশাদ,

(ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى[النجم: 8])

''তারপর সে (নাবীর) নিকটবর্তী হল, তারপর আসল আরো নিকটে,'

(আন-নাজ্ম ৫৩ : ৮)

'তৎপর সে নিকটে আসল এবং আরও নিকটে আসল।' এটা ঐ নৈকট্য থেকে ভিন্ন যেটা মি'রাজের ঘটনায় ঘটেছিল। কেননা, সূরাহ নাজমে যে নৈকট্যের উল্লেখ রয়েছে তাতে জিবরাঈল (আঃ)-এর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমনটি 'আয়িশাহ সিদ্দীকা (রাঃ) এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন এবং বর্ণনা ভঙ্গিতেও এটাই নির্দেশিত হচ্ছে। এর বিপরীত মি'রাজের হাদীসে যে নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে তাতে সর্বশক্তিমান প্রভূ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সূরাহ নাজমে একথার কোন উল্লেখ নেই। বরং তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুবার তাঁকে তাঁর আসলরূপে দেখেছিলেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। এ সম্পর্কে সঠিক কী, সেটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

এ সময় পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল 'আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে আপনার উম্মত পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। সম্ভবতঃ এর তাৎপর্য এই ছিল যে, তাঁর রেসালাত নীল ও ফোরাত নদের শস্য শ্যামল এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতি ঘটাবে এবং এখানকার মানুষ বংশপরম্পরা সূত্রে মুসলিম হবে। ব্যাপারটি এ নয় যে, এ দু'পানির উৎস জান্নাত থেকে উৎসারিত হচ্ছে। অবশ্য আল্লাহই সব কিছু ভাল জানেন। তিনি জাহান্নামের

মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখমন্ডলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

তিনি তাদেরকেও দেখেছিলেন যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে চলেছে। তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উটের ঠোঁটের মতো। তারা পাথরের টুকরোর মতো আগুনের ফুলকি মুখের মধ্যে পুরছিল এবং সেগুলো গুহ্যদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে আসছিল।

তিনি সুদখোরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের পেটগুলো এতই প্রকান্ড আকারের ছিল যে, পেটের ভার বহন করা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ব্যাপার এবং পেটের ভারে এদিক ওদিক নড়াচড়া তাদের পক্ষে ক্রমেই সম্ভব হচ্ছিল না। অধিকন্তু, ফেরাউনের বংশধরগণকে যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের জন্য পেশ করা হচ্ছিল তখন তারা এদেরকে পদদলিত করে অতিক্রম করছিল।

এক পর্যায়ে তিনি ব্যভিচারীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের সম্মুখে টাটকা ও মোটা গোস্ত ছিল এবং তার পাশে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস ছিল। এরা টাটকা ও মোটা গোস্ত বাদ দিয়ে পচা গোস্ত খাচ্ছিল।

তিনি সেই সকল স্ত্রীলোকদেরকেও দেখেছিলেন যারা স্বামীদেরকে অন্যের ঔরষ জাত সন্তান প্রদান করত। (অর্থাৎ তারা ছিল ব্যভিচারিণী, ব্যভিচারের কারণে তারা পর পুরুষের বীর্যে গর্ভ ধারণ করত কিন্তু স্বামীর অজানতে সে সন্তান স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত)। তিনি দেখলেন তাদের বক্ষস্থল বড় বড় বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

যাতায়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরববাসীদের এক বণিক দলকেও দেখেছিলেন এবং তাদের এক পলাতক উট দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পানিও পান করেছিলেন। ঐ পানি একটি পাত্রে ঢাকা ছিল। এ সময়ে বণিকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পানি পান করার পর পুনরায় তিনি পাত্রটিকে ঢেকে রেখেছিলেন। মি'রাজের রাত্রিশেষে

সকাল বেলা এ ঘটনাটি তাঁর (সাঃ) দাবীর সত্যতা প্রমাণার্থে দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশেণর জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্বিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণ ও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমন কি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না।

পক্ষান্তরে আবূ বাকর (রাঃ) এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবূ বাকর (রাঃ) কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তঃকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

মি'রাজের প্রসঙ্গ এবং উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে সব চাইতে সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে,

)لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا( ]الإسراء:

‘‘এ জন্য যে, আমি (আল্লাহ তা‘আলা) তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাব।’

(আল-ইসরা ১৭ : ১)

নাবী (আঃ)-দের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার এটাই নীতি। সূরাহ আনআমে বলেছেন,

)وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ( ]الأنعام:75[

‘‘ এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।’ (আল-আন‘আম ৬ : ৭৫)

তারপর আল্লাহ মূসাকে বললেন,

)لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى( ]طه:23[

‘যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনগুলোর কিছু দেখাতে পারি।’

(ত্ব-হা ২০ : ২৩)

ফলে যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান এভাবে প্রত্যক্ষদর্শিতার সনদ প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁদের আয়নুল ইয়াকীনের (স্বচক্ষে দর্শনের) ঐ পর্যায় হাসেল হয়ে যায়। যার সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়। যেমন শোনা কি দেখার মতো হয়। আর এই কারণেই নাবীগণ (আঃ) আল্লাহর পথে এমন সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন অন্য কেউ তা পারেন না। একারণে ঐ শক্তির পক্ষ থেকে আসা কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা দুঃখ কষ্টকে তাঁরা দুঃখ কষ্ট বলে মনেই করতেন না।

এ মি’রাজের ঘটনার অন্তরালে যে সকল বিজ্ঞানময় এবং রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে তার আলোচনার স্থান হচ্ছে শরীয়ত দর্শনের পুস্তকাবলী। কিন্তু এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার দ্বারা এ বরকতময় সফরের স্রোতস্বিনী থেকে প্রবাহিত হয়ে নাবী (সাঃ)-এর জীবন উদ্যান অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে সে সব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল,

পাঠকেরা দেখতে পায় যে, আল্লাহ তা‘আলা সূরাহ বণী ইসরাঈলে রাত্রি ভ্রমণের ঘটনা কেবলমাত্র একটি আয়াতে বর্ণনা করে কথার মোড় ইহুদীদের অন্যায় ও পাপকার্যের

বর্ণনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এ কুরআন ঐ পথের সন্ধান দেয় যে পথ হচ্ছে সব চাইতে সোজা-সরল ও শুদ্ধ। কুরআন পাঠকেরা হয়তো সন্দেহ করতে পারে যে, কথা দুটির মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা এ বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদীগণকে মানুষের নেতৃত্ব দেয়া থেকে বরখাস্ত করা হবে। কারণ তারা এমন সব অন্যায় করেছে যে, ঐ সকল কর্ম করার পর তাদেরকে ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত রাখা সঙ্গত নয়। কাজেই এ পদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদান করা হবে এবং ইবরাহীমী দাওয়াতের দুটি কেন্দ্রকেই তাঁর নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করা হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, এখন এমন এক অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে যার ফলে আত্মিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি এক সম্প্রদায়ের নিকট হতে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করা দরকার। অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাদের ইতিহাস বিশ্বাস ঘাতকতা, খেয়ানত, আসাধূতা, অন্যায়, অত্যাচার ও অপকর্মে ভরপুর তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য এক উম্মত বা সম্প্রদায়কে দায়িত্বভার দেয়া দরকার যাঁরা প্রবাহিত হবেন কল্যাণ ও পুণ্যের প্রস্রবন হয়ে এবং যাঁদের নাবী (সাঃ) সর্বাধিক হেদায়েত প্রাপ্ত, সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহর বাণী কুরআনের দ্বারা লাভবান হবেন।

কিন্তু যখন এ উম্মতের রাসূল (সাঃ) মক্কার পর্বত শ্রেণীতে মানুষের মাঝে ঠক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছেন তখন এ প্রত্যাবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা একটা সে সময়ের প্রশ্নমাত্র, যে সময় এক অন্য রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হচ্ছিল। আর সেই রহস্যটি ছিল, ইসলামী দাওয়াতের একটি পর্যায় শেষ যার ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন আয়াতে অংশীবাদীদেরকে খোলাখুলি সতর্ক করে ধমক দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

)وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِن بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا(

]الإسراء:16، 17[

‘‘আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার ‘আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই। ১৭. নূহের পর বহু বংশধারাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, বান্দাহ্দের পাপকাজের খবর রাখা আর লক্ষ্য রাখার জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ’ [আল-ইসরা (১৭) : ১৬-১৭]

পক্ষান্তরে এ সকল আয়াতের পাশে পাশে এমন সব আয়াতও রয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিমগণকে তাহযীব, তমদ্দুনের এমন সব নিয়ম-কানুন এবং প্রতিরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে নবাগত ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি নির্মিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় হতে পারে। মনে হয় মুসলিমগণ এখন এমন এক সরজমিনের উপর নিজ ঠিকানা বানিয়েছেন সেখানে সকল দিক দিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী আপন হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং সমাজ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এক ঐকমত্য গঠনে সক্ষম হয়েছেন যার উপর ভিত্তি করে সমাজের যাঁতা ঘুরছে। অধিকন্তু, এ আয়াতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অচিরেই এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, যা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নৈশ ভ্রমণ ও মি’রাজ বরকতময় ঘটনার তলদেশে হিকমত ও রহস্যসমূহের মধ্যে এমন একটি হিকমত যা আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য বর্ণনা উপযোগী মনে করে আমি এখানে তা লিপিবদ্ধ করলাম। এরকম দুটি বিরাট হিকমতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আমি এ ব্যাপারে মতস্থির করেছি যে, এ নৈশ ভ্রমণের ঘটনা ‘আক্বাবাহর প্রথম বাইআতের ঘটনার কিছু পূর্বের অথবা দু’বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা সব চাইতে ভাল জানেন।

আক্বাবার প্রথম বাইয়াত

পূর্বে আমি বলেছি যে, একাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, 'আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব।'

এর ফল হল যে, পরবর্তী বছর যখন হজ্বের মৌসুম এল তখন বারোজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রেআব ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরাই ছিলেন যাঁরা পূর্বের বছর এসেছিলেন। এছাড়া অন্য সাত জন ছিলেন নতুন। এর মধ্যে কেবল দুজন আউস গোত্রের। তাছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। এ লোকগুলো মিনার 'আকাবাহর নিকটে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ঐ কথাগুলো সবই পরবর্তীকালে সম্পাদিত হুদায়বিয়াহর সন্ধিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'এসো, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবেনা, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোন ভাল কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরষ্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সবের মধ্যে কোন কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হবে, চাইলে তিনি শাস্তি দিবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দিবেন। উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নাবী (সাঃ)-এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

মদিনায় ইসলাম প্রচারকের দল

অঙ্গীকার সম্পাদিত এবং হজ্বব্রত সম্পন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ লোকদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রথম ধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করলেন। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নব দীক্ষিত মুসলিমগণকে ইসলামের আহকাম এবং ধর্মের নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল যারা এখনও শিরকের উপরেই রয়ে গেছে তাদের নিকট ইসলাম প্রচার করা। নবী কারীম (সাঃ) এ প্রবাসের জন্য প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে স্বনামধন্য এক যুবককে নির্বাচন করেন যার নাম হল মুসআব বিন উমায়ের আবদারী (রাঃ)। মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) মদীনায় গিয়ে আস'আদ বিন যুবারাহ (রা:)-এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াসরিববাসীদের নিকট প্রবল উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রচারণার কাজ আরম্ভ করলেন।

আক্বাবাহর দ্বিতীয় শপথ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে (জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াসরিবের সত্তর জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিক হজ্বযাত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইয়াসরিবের মধ্যে কিংবা মক্কার পথে ছিলেন এমন এক পর্যায়ে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকলেন, 'আমরা কতদিন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এভাবে মক্কার পাহাড় সমূহের মধ্যে চক্কর ও ঠোক্কর খেতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফেলে রাখব?'

এ মুসলিমগণ যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন গোপনে নাবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে এ কথার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আইয়ামে তাশরীকের[1] মধ্য দিবসে (১২ই জিলহজ্জ তারীখে) উভয় দল মিনায় জামরাই উলা, অর্থাৎ জামরাই 'আক্বাবাহর নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হবে। এ

ঐতিহাসিক সমাবেশ কিভাবে ইসলাম ও মূর্তিপূজার মধ্যে চলমান সংঘর্ষের মোড় পালটিয়ে দেয় তা একজন আনসার সাহাবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়।

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম। আইয়াম তাশরীকের মধ্যবর্তী দিবাগত রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল। আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন হারামও উপস্থিত ছিলেন (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। মুশরিকগণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে আগত অন্যান্য মুশরিকদের থেকে আমাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন হারামের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন ঠিকভাবেই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, 'হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডের ইন্ধন হয়ে না যান। এর পর তাঁকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং বললাম যে, 'আজ 'আক্বাবাহয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথাবার্তা আছে'', তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে 'আক্বাবাহয় গমন করলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন।

কা'ব (রাঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা এ রাতেও যথারীতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন রাত্রের তৃতীয় অংশ অতিবাহিত হল তখন আমরা নিজ নিজ তাঁবু থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে গেলাম যেমনটি পাখি নিজ বাসা থেকে নিজেকে জড়োসড়ো করে বের হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলে গিয়ে 'আক্বাবাহয় একত্রিত হলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট পঁচাত্তর জন। তেহাত্তর জন্য পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। মহিলা দু'জনের একজন ছিলেন উম্মু আম্মারা নাসীবা বিনতে কা'ব। তিনি কাবিলা বনু মাযেন বিন

নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন উম্মু মানী আসমা বিনতে ‘আমর। তিনি বনু সালামাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

আমরা সকলে সুড়ঙ্গে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে এসে পড়ল এবং তিনি তশরীফ আনয়ন করলেন। সঙ্গে ছিলেন তার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। যদিও তিনি তখনো নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তবুও তিনি এটা চাচ্ছিলেন যে, আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের সমস্যায় উপস্থিত থাকেন যাতে তাঁর পূর্ণ ইত্বমিনান হাসিল হয়ে যায়। তিনিই সর্বপ্রথম কথা বলা আরম্ভ করেন।

বাইয়াতের দফাসমূহ

ইমাম আহমাদ জাবির (রাঃ) হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেছেন, ‘আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?’

তিনি বললেন, ‘তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২. অভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভৎর্সনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্রে ইবনে ইসহাক্ব যে আলোচনা করেছেন তাতে শেষ ধারার (৫) কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দানের পর বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার শপথ গ্রহন করছি যে, তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাযত করবে যে সকল জিনিস থেকে তোমরা আপন ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাক।' এ কথা বলার পরেই বারা (রাঃ) বিন মা'রুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধরে বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সুনিশ্চিত আমরা আপনাকে ঐ সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব, যে সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের সন্তান এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদের এ পদ্ধতি বাপদাদার কাল থেকে চলে আসছে।

কা'ব (রাঃ) বলেন যে, বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় আবুল হায়সাম বিন তায়হান কথার ছেদ কেটে বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও কিছু মানুষের অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি ও সন্ধির বন্ধন রয়েছে, আর আমরা এখন সে বন্ধন ছিন্ন করছি। তা হলে এ রকম তো হবে না যে, আমরা এরূপ করে ফেলি তারপরে আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে নিজ জাতির দিকে ফিরে যাবেন।'

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃদু হেসে বললেন, 'না, বরং তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস, আমি তোমাদেরই এবং তোমরাও আমারই। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব।

বাইয়াতের বিপজ্জনক দিকের স্মরণ

অঙ্গীকারের শর্তাদি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রায় সমাপ্তির পথে এবং লোকজনেরা যখন অঙ্গীকার গ্রহণ আরম্ভ করতে যাচ্ছেন এমন সময় প্রথম সারির দুজন মুসলিম যারা একাদশ বা দ্বাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উঠে পড়েন, যাতে মানুষের সামনে তাদের দায়িত্বের নাজুকতা ও ভয়াবহতা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপদাপদের ব্যাপারটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করার প্রেক্ষাপটে সমস্যার সকল দিক ভালভাবে অবহিত হওয়ার পর তারা শপথ গ্রহণ করে। এর পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে এ সকল লোকজন কতটুকু আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে তা অনুধাবন করা।

ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন যে, যখন লোকজন অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য একত্রিত হলেন তখন আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'তোমরা কি জানো যে, তাঁর সাথে (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল) কোন কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ?' তাঁরা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জী হ্যাঁ''।

আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'লাল ও কালো মানুষের বিরুদ্ধে জান্নাতের বিনিময়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমরা তাঁর কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এ রকম ধারণা যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের দলের সম্ভ্রান্ত লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে তাহলে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা , তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও তাহলে ইহ ও পরকালের জন্য তা হবে চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে যে, তোমাদের ধনমাল ধ্বংসের এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি সম্পন্ন করবে যার প্রতি তোমরা তাকে আহবান করছ তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। কেননা, আল্লাহর শপথ! এতেই ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

এ কথা শ্রবণের পর সকলেই সমবেত কণ্ঠে বললেন, ‘ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যার মতো অত্যন্ত বিপদ সংকুল পরিস্থিতির বিনিময়ে এটা আমরা গ্রহণ করছি। তবে হাঁ একটি প্রাসঙ্গিক কথা, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা যদি যথাযথভাবে এ অঙ্গীকার পূরণ করি তবে প্রতিদানে আমাদের জন্য কি পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে?

তিনি বললেন, ‘জান্নাত’’।

লোকেরা বললেন, ‘আপনার হাত মুবারক প্রশস্ত করুন।’

তিনি হাত প্রসারিত করলে লোকেরা তাঁর হাত ধারণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।[1]

জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনা হচ্ছে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য যে সময় আমরা দাঁড়ালাম সে সময় সত্তর জনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য আস’আদ বিন যুরারাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধারণ করে বললেন, ‘ইয়াসরিববাসীরা! একটু থেমে যাও। আমরা উটের কলিজা নষ্ট করে (অর্থাৎ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে) এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আজ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সমস্ত আরববাসীর সঙ্গে শত্রুতা, তলোয়ারের আঘাতে তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হত্যা এবং ধন-সম্পদের অসামান্য ক্ষয়-ক্ষতি। অতএব, যদি এ সব সহ্য করতে পার তবে তাকে নিয়ে চল। এ সবের বিনিময়ে আল্লাহর সমীপে তোমাদের জন্য যে মহা পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে ‘জান্নাত’’। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাইতে এ সব কিছুই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও। এটাই হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপত্তি।

বাইয়াতের পূর্নতা লাভ

বাইআতের শর্ত বা দফাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিক গুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্বর বলে উঠলেন, 'আস'আদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না।উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আস'আদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ মুসআব বিন উমায়েরের সাথে একযোগে মদীনায় ইসলাম প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। ফলে তিনিই সর্বপ্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু নাজ্জার বলেছেন আবূ উমামা আস'আদ বিন যুরারাহ সর্ব প্রথম মানুষ যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। এরপর সাধারণ অঙ্গীকার অুনষ্ঠিত হয়। জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা একে একে দাঁড়ালাম আর নাবী কারীম (সাঃ) আমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।

অবশিষ্ট রইলেন দুজন মহিলা যাঁরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শপথ হল মৌখিক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করেন নাই।

কুরাইশদের আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুত

শয়তানের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করে, আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি ন্যায়ের সঙ্গে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি চান তাহলে আমরা কালই তরবারী নিয়ে মিনাবাসীর উপর আক্রমণ চালাই। তিনি (সাঃ) বললেন, 'আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি।' অতএব আপনারা নিজ নিজ আস্তানায় চলে যান।'

কাজেই লোকেরা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এভাবেই সকাল হয়ে গেল।

ইয়াসরিবী নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের ক্ষোভ

এ সংবাদ কুরাইশদের কর্ণকুহরে পৌঁছিবা মাত্র অসহনীয় দুঃখে বেদনা হেতু তাদের মাঝে কলরব শুরু হয়ে গেল। কেননা, মুসলিমগণের এ ধরণের অঙ্গীকার ও চুক্তির সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে তাদের জীবন ও সম্পদের উপরে হবে সেটা ভালভাবেই জানা ছিল। সুতরাং, সকাল হওয়া মাত্র তাদের নেতা ও মাস্তানদের ভারী দল ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর উদ্দেশ্যে মদীনাবাসীদের তাঁবু অভিমুখে যাত্রা করল এবং এইভাবে আবেদন জানাল,

হে খাযরাজের লোকেরা! আমরা অবগত হলাম যে, আপনারা আমাদের এ মানুষটিকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন ও আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছেন। অথচ আরব গোত্র সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আপনাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের অপছন্দ কাজ।

কিন্তু যেহেতু এ বাইআত অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু খাযরাজ মুশরিকগণ এ সম্পর্কে মোটেই টের পায় নি। সেজন্য তারা বার বার আল্লহর কসম খেয়ে বলল সে রকম কিছু অনুষ্ঠিত হয় নি। আমরা এ বিষয়ে বিন্দু মাত্র অবগত নই। পরিশেষে বিক্ষোভে শামিল এ দল আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সুলুলের নিকট পৌঁছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিকট জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে সে বলল 'নিশ্চয় এটা বাজে কথা। এমনটি কিছুতেই হতে পারে না যে, আমার সম্প্রদায় আমাকে এড়িয়ে আমার অগোচরে এ রকম কোন কাজ করতে পারে। আমি ইয়াসরাবে থাকতাম, তাহলেও আমার পরামর্শ ছাড়া আমার সম্প্রদায় এরূপ করতনা।

অবশিষ্ট রইলেন মুসলিমগণ, তাঁরা আড় চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখলেন এবং চুপচাপ রইলেন। এমন কি হ্যাঁ কিংবা না বলেও কেউ মুখ খুললেন না। শেষ পর্যন্ত

কুরাইশ নেতাদের ধারণা হলো মুশরিকদের কথা সত্য এবং এ কারণে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

সংবাদের সত্যতা ও পরবর্তী ঘটনা:

মক্কার কুরাইশ নেতাগণ সম্ভবতঃ দৃঢ়তার সঙ্গে এটা ধরেই নিয়েছিল যে, এ সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু এর অনুসন্ধানে সর্বদা লেগেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে আবগত হল যে, অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সত্য। এ ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তারা অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে। কিন্তু যখন তারা এ সংবাদটি অবগত হল তখন অঙ্গীকারাবদ্ধ হাজীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। মক্কাবাসীগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়েও তাঁদের নাগাল পেলনা। অবশ্য সা'দ বিন উবাদাহ এবং মুনযির বিন 'আমরকে দেখে ফেলে এবং তাদেরকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু মুনযির অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন। অবশ্য সা'দ বিন উবাদাহ তাদের হাতে ধরা পড়ে যান। তারা তাঁর হাত দুটো তাঁরই পালানের দড়ি দ্বারা গর্দানের পিছনে বেঁধে দেয়। কষ্ট দিতে দিতে মক্কা পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু জ মুত্ব'ঈম বিন আদী এবং হারিস বিন হারব বিন উমাইয়া এসে তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। কারণ, তাদের দুজনের যে বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথ দিয়ে যাতায়াত করত তা সায়াদের আশ্রয়েই চলাচল করত। তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ায় আনসারগণ খুবই বিব্রতবোধ করতে থাকেন এবং তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য সলা পরামর্শ করতে থাকেন। ইতি মধ্যে দেখা গেল যে, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেছেন। এরপর সকলেই নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[

এটাই হচ্ছে 'আক্বাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকার যাকে 'আক্বাবাহর বড় শপথ বলে অভিহিত করা হয়। এ অঙ্গীকার এমন এক খোলা জায়গায় সম্পাদিত হয়েছিল যা ভালবাসা ও ওয়াদাপালন, সততা, বিচ্ছিন্ন ঈমানদারদের মধ্যে সাহায্য, সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, আস্থা ও বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। ফলে ইমানদার ইয়াসরিববাসীদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি দয়ামায়ায় ভরপুর ছিল।

মক্কার অধিবাসী ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি ছিল না। অধিকন্তু, তাঁদের প্রতি অত্যাচার কারীদের বিরুদ্ধে দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্রোধছিল। তাঁদের অন্তর এ ভাইদের ভালবাসায় ভরপুর ছিল যাদের না দেখে আল্লাহর ওয়াস্তে ভাই নির্ধারণ করেছিল।

আর এ উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুধাবন শুধু একটি কল্পিত আকর্ষণের ফলই ছিল না, যা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে পারে বরং এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান। অর্থাৎ যে ঈমান অন্যায় অত্যাচারের বড় থেকে বড় শক্তির কাছেও মাথানত করে না। যে ঈমানেরই বদৌলতে (কারণে) এমন সব যুগান্তকারী কর্ম ও কীর্তিমালা স্থাপিত হয়েছে এবং মানবজাতির ইতিহাসে এমন সব অধ্যায় রচিত হয়েছে যার তুলনায় অতীত কিংবা বর্তমান কোন কালেই মিলে না। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও মিলবে না।

হিজরতের প্রথম বাহিনী

‘আক্কাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকার যখন সুসংবাদ ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করল তখন নাস্তিকতা ও মূর্খতার তৃণ শস্য বিহীন মরুভূমিতে ইসলাম মহীরূহের ভিত্তিমূল বহুলাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। ইসলামী দাওয়াতের জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লে–খযোগ্য সফলতা। এরপরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমগণকে এ নতুন দেশে হিজরত করার (দেশত্যাগ করার) অনুমতি প্রদান করেন।

হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ সুবিধা ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এবং ধন দৌলত ও সহায় সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মুশরিকবেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

পানে। জানা ছিল না আগামীতে কোন্ ধরণের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে।

মুসলিমগণ এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, এর মধ্যে বিপদ লুকায়িত রয়েছে। হিজরতের কয়েকটি নমুনা পাঠকগণের খিদমতে পেশ করা হল।

১. সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবূ সালামাহ (রাঃ)। ইবনে ইসহাক্বের মতে তিনি 'আক্বাবাহর বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুর পক্ষ বলল, 'আপনার নিজ প্রাণের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর জয়ী হলেন। কিন্তু আমাদের কন্যাকে আপনার সঙ্গে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

এ কথা বলার পর তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে আবূ সালামাহ (রাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তোমরা যখন এ মহিলাকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ তখন আমরাও আমাদের সন্তানটিকে কিছুতেই থাকতে দিতে পারি না।'

তারপর সন্তানটিকে নিয়ে উভয় পক্ষ টানাটানির ফলে শিশুটির একটি হাত উপড়ে গেল। এমন এক অবস্থার মধ্যে আবূ সালামাহর আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটিকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে যান। এ কারণে আবূ সালামাহকে একাকী মদীনা গমন করতে হয়।

এরপর থেকে উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর অবস্থা এমনটি হল যে, প্রত্যহ সকালে তিনি আবতাহ (যেখানে এ ঘটনা ঘটেছিল) আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কোন এক আত্মীয় গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। তিনি বলেন, কেন একে যেতে দিচ্ছ না। অনর্থক কেন তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

এ কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়রা তাকে বলল, তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে স্বামীর নিকট যেতে পার। তখন তিনি সন্তানটিকে তার দাদার বাড়ী হতে ফেরত নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। এ সফর হলো দীর্ঘ পাঁচশত কিলোমিটারের। আর তাঁকে পথ চলতে হবে দুর্গম পাহাড় ও ভয়ংকর সব উপত্যকা হয়ে অথচ তার সাথে কোন সঙ্গী-সাথী নেই। আল্লাহ আকবার! সন্তান সহ যখন তিনি তানঈম গিয়ে পৌঁছলেন তখন উসমান বিন আবূ ত্বালহাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অবস্থা অবগত হয়ে সহযাত্রীরূপে মদীনা পৌঁছানোর জন্য নিয়ে গেলেন। যখন জনবসতি দৃষ্টি গোচর হল তখন তিনি বললেন, 'এ গ্রামে তোমার স্বামী আছেন, এ গ্রামে চলে যাও। আল্লাহ বরকতময়, বরকত দিন''। এরপর তিনি মক্কার অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

২. সুহাইব (রাঃ) যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ বলল, 'তুমি যখন আমাদের নিকট এসেছিলে তখন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক ছিলে। কিন্তু এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন সম্পদ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এখন তুমি চাচ্ছ যে, তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! এ কিছুতেই হতে পারে না।'

সুহাইব (রাঃ) বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যদি আমার ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তবে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিব?

তারা বলল, 'হ্যাঁ'

সুহাইব বললেন, 'বেশ ঠিক আছে। চলো আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তোমাদেরকে দিয়ে দিই।' (তারপর তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর মহববতে তার সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিলেন)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সুহাইব লাভবান হয়েছেন, সুহাইব লাভবান হয়েছেন।

৩. উমার বিন খাত্তাব (রাঃ), আইয়াশ বিন আবী রাবী'আহ (রাঃ), হিশাম বিন আস বিন ওয়ায়িল (রাঃ) নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করলেন যে, সারিফ-এর তানাযুব স্থানে খুব

সকালে একত্রিত হয়ে সেখানে থেকে মদীনা হিজরত করা হবে। উমার (রাঃ) ও আইয়াশ (রাঃ) যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু হিশাম বন্দি হয়ে গেলেন।

এ দিকে উমার (রাঃ) ও আইয়াশ (রাঃ) যখন মদীনায় গিয়ে 'কুবাতে' অবতরণ করলেন তখন আবূ জাহল ও তার ভাই হারিস আইয়াশের নিকট উপস্থিত হল। তারা তিন জন ছিল একই মায়ের একই মায়ের সন্তান। তারা দুজন আইয়াশ (রাঃ) কে বলল, 'তোমার এবং আমাদের মাতা নযর (মানত) মেনেছে যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত চুল আঁচড়াবে না এবং রোদ ছেড়ে ছায়াতে আশ্রয় নেবে না। এ কথা শ্রবণে আইয়াশ (রাঃ) আপন মায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়াদ্র হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে উমার (রাঃ) আইয়াশ (রাঃ)-কে বললেন, 'দেখ আইয়াশ! আল্লাহর কসম! এরা তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে সরিয়ে বিপদে ফেলার জন্য এ কূট কৌশল অবলম্বন করেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আল্লাহর কসম! তোমার মাতাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয় তবে সে অবশ্যই ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু আইয়াশ সে কথায় কর্ণপাত না করে মাতার কসম পূর্ণ করার জন্য ঐ দুজনের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

উমার (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মাতার ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে তুমি যখন দৃঢ় সংকল্প তখন তোমার যাতায়াতের সুবিধার্থে আমার উটনীটি নিয়ে যাও। এ হচ্ছে খুবই দ্রুতগামী এবং শান্ত স্বভাবের একে যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে হাতের বাইরে ছেড়ে দেবে না। তাছাড়া মক্কার মুশরিকগণের নিকট হতে কোন প্রকার অনিষ্ট কিংবা অসদাচরণের আশঙ্কা থাকলে পালিয়ে আসবে।

আইয়াশ (রাঃ) উটনীর উপর আরোহণ করে তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর এক জায়গায় আবূ জাহল বলল, 'ভাই আমার এ উট নিয়ে তো খুব অসুবিধায় পড়তে হল। তুমি কি আমাকে তোমার পশ্চাতে ঐ উটনীর পিঠে বসিয়ে নেবে?'

আইয়াশ বললেন, 'ঠিক আছে' তারপর তিনি উটনীকে বসিয়ে দিলেন।

তারা দুজনে আপন আপন উটকে বসিয়ে দিল যাতে আবূ জাহাল তার উটের পিঠ থেকে নেমে গিয়ে আইয়াশ (রাঃ)-এর উটনীর পিঠে গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তিনজনেই যখন মাটিতে নেমে পড়ল তখন হঠাৎ তারা দুজনে মিলিতভাবে আইয়াশ (রাঃ)-এর উপর আক্রমণ চালাল এবং দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল। তারপর তাঁকে এ বাঁধা অবস্থাতেই দিবাভাগে মক্কায় নিয়ে এসে মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে মক্কাবাসী! আপনারা আপনাদের অবোধদের সঙ্গে এরূপ করবেন যেমন আমরা আমাদের অবোধের সঙ্গে করেছি।

হিজরতের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণকারীদের সম্পর্কে জানতে পেরে মক্কার মুশরিকগণ তাঁদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করত। তার তিনটি নমুনা এখানে পেশ করা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের ধারা অব্যাহত থাকল যার ফলে 'আক্বাবাহর বড় অঙ্গীকারের পর মাত্র দু'মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবূ বাকর ও আলী রাঃ ব্যতীত কোন মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'র নির্দেশে এরা দুজন মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। অবশ্য আরও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম মক্কায় ছিলেন যাদেরকে মুশরিকগণ বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ মাল-সামানা গোছগাছ করে রেখে যাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রবাসের সামগ্রী বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সহীহুল বুখারীতে 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) মুসলিমগণকে বললেন, 'আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে লাওয়ার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানের এলাকা। এরপর মুসলিমগণ মদীনার দিকে হিজরত করলেন। হাবশের সাধারণ মোহাজেরগণও মদীনায় হিজরত করলেন। আবূ বাকর (রাঃ)-ও মদীনায় হিজরতের জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'একটু থেমে যাও। কেননা আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বাকর বললেন, 'আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনার জন্যও কি হিজরতের অনুমতি আশা করতে পারি।'

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’।

এরপর আবূ বাকর (রাঃ) থেমে গেলেন যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফর করতে পারেন। তাঁর কাছে দুটো উটনী ছিল। তিনি তাদের চার মাস ধরে ভালভাবে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুললেন যাতে তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পথ চলতে পারে।

রাসুল ﷺএর হিজরত

রাসুল ﷺএর বাড়ি ঘেরাও:

এক দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন, অন্য দিকে মক্কার পাপিষ্ঠরা দারুন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্ন তালিকাভুক্ত এগার জন পাপীষ্ঠকে নির্বাচন করা হল। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ

(১) আবূ জাহল বিন হিশাম, (২) হাকাম বিন আবীল ‘আস, (৩) উক্ববা বিন আবূ মু’আইত্ব, (৪) নাযর বিন হারিস (৫) উমাইয়া বিন খাআফ, (৬) যাম’আহ বিন আসওয়াদ, (৭) তু’আইইমা বিন আদী, (৮) আবূ লাহাব, (৯) উবাই বিন খালাফ, (১০) নুবাইহ বিন হাজ্জাজ এবং তার ভাই (১১) মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।[1]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল তিনি এশার সালাত পর রাত্রের প্রথম প্রহরে ঘুমিয়ে যেতেন এবং অর্ধ রাত্রিতে জেগে মাসজিদুল হারামে চলে যেতেন। তিনি (সাঃ) সেখানে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘আলী (রাঃ)-কে বললেন, ‘তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলো, ধরনীতে নিস্তব্ধতা নেমে এল এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল- এমন সময় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর বাড়িতে হাজির হলো। তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরের দরজায় অবস্থান করলো। তাদের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুমিয়ে আছেন, তিনি যখনই বেন হবেন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করবে।

তাদের এ ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের অবস্থা এতই দৃঢ় ছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কেল াহ ফতেহ করে দেবে। আবূ জাহল চরম অহংকার, উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাবী (সাঃ)-এর গৃহ ঘেরাওকারী আপন সঙ্গীদের বলল, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) বলছে যে, যদি তোমরা তার ধর্মে প্রবেশ কর, তার অনুসরণ কর তাহলে অনারবদের উপর আরবদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন উরদুনের বাগান সমূহের মতো বাগান দেয়া হবে। আর যদি তোমরা তা না কর তাহলে তার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর পর আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে না কি অনন্ত কাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

যাহোক, জঘন্যতম এ পাপাচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল রাত দুপুরের পরক্ষণ। এ জন্য তারা রাত জেগে সময় কাটাচ্ছিল এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তাঁর বিজয়ই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়। তাঁরই একক এখতিয়ারে রয়েছে আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাঁকে বাঁচাতে চান কেউই তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পাকড়াও করতে চান পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতে কারীমায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

(وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ) [الأنفال:30].

‘‘স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।’ (আল-আনফাল ৮ : ৩০)

রাসুল ﷺএর হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ:

কুরাইশ মুশরিকগণ তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। উন্মত্ত জিঘাংসু শত্রু পরিবেষ্টিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে বললেন, ‘তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী[1] চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন।[2]

তারপর নাবী কারীম (সাঃ) গৃহের বাহিরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি দরে রাখলেন যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এ আয়াত কারীমাটি পাঠ করছিলেন,

(وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ) [يس:9]

‘‘তাদের সামনে আমি একটা (বাধার) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না।’ (ইয়া সীন ৩৬ : ৯)

এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেন নি। এরপর তিনি আবূ বাকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে ‘সাওর’ নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন।[3]

এদিকে অবরোধকারীরা রাত ১২ টার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তার আগেই তাদের নিকট তাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার সংবাদ পৌঁছে গেল। অবস্থা হল এই যে, তাদের নিকট এক আগন্তুক এসে তাদেরকে সাঃ-এর দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল

‘আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, ‘আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে খতম করার অপেক্ষায় রয়েছি।

সে বলল, ‘উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছ। আল্লাহর কসম! কিছুক্ষণ পূর্বে মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি তোমাদের মাথার উপর এক মুষ্টি মৃত্তিকা ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন।’

তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে দেখিনি। এ বলে তারা মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর দারুণ হতাশা ও ক্রোধের সঙ্গে তারা দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গৃহের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকল। চাদর জড়ানো অবস্থায় শায়িত আলী (রাঃ) দৃষ্টি গোচর হলে তারা বলতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! এই তো মুহাম্মাদ (সাঃ) শুয়ে আছে।’ তিনি শুয়ে আছেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এ দিকে যখন সকাল হল এবং আলী (রাঃ) বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন তারা বুঝতে পারল যে, সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ (সাঃ)-নেই। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ‘মুহাম্মাদ (সাঃ) কোথায়’’? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, ‘‘আমি জানিনা।’’

- **গুহা থেকে গুহা:**

রাসূলুল্লাহ ২৭শে সফর চতুর্দশ নবুওয়াত সাল মোতাবেক ১২/১৩ই সেপ্টেম্বর, ৬২২[1] খ্রিষ্টাব্দ মধ্যরাতের সামান্য কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বাহির হয়ে জান-মালের ব্যাপারে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আবূ বাকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে পিছনের একটি জানালা দিয়ে বাহির হয়ে দুজনই পথ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকেন যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মক্কা নগরীর বাহিরে চলে যেতে সক্ষম হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তার সন্ধানে লেগে পড়বে এবং সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে তা হচ্ছে মদীনার কর্মব্যস্ত রাস্তা যা উত্তর দিকে গেছে। এ জন্য তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন যে পথটি ছিল সেই পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থাৎ ইয়ামান যাওয়ার পথ যা মক্কার দক্ষিণে

দিকে অবস্থিত ছিল। এ পথ ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সুপ্রসিদ্ধ সওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ পর্বতটি ছিল খুব উঁচু, পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথ ছিল অাঁকা-বাঁকা ও পাক জড়ানো। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। এ পর্বত গাত্রের এখানে-সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগলকে ক্ষত-কিক্ষত করে ফেলেছিল। বলা হয়েছে যে, তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য তাঁর পা জখম হয়েছিল। যাহোক, আবূ বাকর (রাঃ)-এর সহায়তায় তিনি পর্বতের শৃঙ্গদেশে অবস্থিত গুহার পাশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ গুহাটিই ইতিহাসে ‘গারে সওর বা সওর গুহা’ নামে পরিচিত।

- **গুহায় প্রবেশ:**

গুহার নিকট উপস্থিত হয়ে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখন গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে দেখি এখানে অসুবিধাজনক কোন কিছু আছে কিনা। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে প্রথমে তা আমার সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে আপনাকে প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথা বলার পর আবূ বাকর (রাঃ) গর্তের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে গর্তটি পরিষ্কার করে নিলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হল না। আবূ বাকর (রাঃ) ছিদ্র দুটোর মুখে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করার পর ভিতরে আগমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরয করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আবূ বাকর (রাঃ)-এর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ)-এর পায়ে ছিদ্র মধ্যস্থিত স্বর্প কিংবা বিচ্ছু কোন কিছুতে দংশন করল। তিনি বিষে কাতর হয়ে উঠলেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর চক্ষু যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল এবং সেই আশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ল রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর মুখমন্ডলের উপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ বাকর (রাঃ)! তোমার কী হয়েছে?''

তিনি আরয করলেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মুখ থেকে কিছুটা লালা নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে আবূ বাকর (রাঃ)-এর দংশন জনিত বিষব্যথা দূরীভূত হল। এ পর্বত গুহায় তাঁরা উভয়ে একাদিক্রমে তিন রাত্রি (শুক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি) অবস্থান করলেন। আবূ বাকর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহও ঐ সময় একই সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর বর্ণনাতে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক। সকলের অগোচরে রাত গভীর হলে তিনি সেখানে যেতেন এবং সাহরী সময়ের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীগণের সঙ্গে মিলিত হতেন। এতে মনে হতো যেন তিনি মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। গুহায় আত্মগোপনকারীগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যে সকল ষড়যন্ত্র করত তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ)-এর গোলাম 'আমির বিন ফুহাইরা পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাত এবং যখন রাত্রির এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকটে যেত এবং আত্মগোপনকারী নাবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীকে (রাঃ) দুগ্ধ পান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পরপর তিন রাত্রেই সে এরূপ করল। অধিকন্তু, আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকরের গমনাগমন পথে তাঁর পদ চিহ্নগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য 'আমির বিন ফুহাইরা সেই পথে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে যেত।

মদীনার পথে রাসুল ﷺ

তিনদিন যাবৎ নিস্ফল দৌড়ঝাঁপ এবং খোঁজাখুঁজির পর যখন কুরাইশদের আকস্মিক প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় অনুসন্ধান কাজের মাত্রা মন্দীভূত হয়ে এল এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত লাইসী যিনি সাহারা জনমানবশুন্য পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, মদীনায় পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য পূর্বে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও মজুরী নির্ধারিত হয়েছিল এবং তার নিকট দুটি বাহনও রাখা হয়েছিল। ঐ ব্যক্তি তখনো কুরাইশ মূর্তিপূজকদের দলভুক্ত থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁর সঙ্গে এ মর্মে কথাবার্তা ছিল যে, তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে তাকে গারে সওর পৌঁছতে হবে। সেই কথা মোতাবেক সোমবারের দিবাগত রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে উপস্থিত হয়ে (সেটি ছিল ১ম হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসের চাঁদনী রাত মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার বাহন দুটির মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবূ বাকর (রাঃ) সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন কিন্তু তাতে ঝুলানোর জন্য বন্ধনের রশি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন যাত্রার সময় হয়ে এল এবং আসমা (রাঃ) সামগ্রী ঝুলাতে গিয়ে দেখলেন তাতে বন্ধন রশি নেই, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ খুললেন এবং তা দু ভাগে ভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক অংশের সাহায্যে সামগ্রী ঝুলিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে কোমর বাঁধলেন। এ কারণেই তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নিত্বাক্বাইন।[1]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বাকর (রাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করলেন। ‘আমর বিন ফুহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত মদীনা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরলেন। সর্বপ্রথম সওর গুহা হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি (পথ প্রদর্শক) ইয়ামেনের পথে যাত্রা করলেন এবং দক্ষিণ

দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তার পরে পশ্চিমদিকে ঘুরে সমুদ্রোপকূলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরে এমন এক পথে নিয়ে গেলেন যে পথের সন্ধান সাধারণ লোকেরা জানত না। এরপর উত্তর দিকে মোড় নিলেন যে পথ লোহিত সাগরের খুব কাছাকাছি ছিল। এপথে খুব অল্প মানুষ চলাচল করত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ পথে যে সকল স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন ইবনে ইসহাক্ব তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পথপ্রদর্শক যখন *তাদের* দুজনকে নিয়ে বের হলেন তখন মক্কার নিম্নভূমি অঞ্চল দিয়ে নিয়ে গেলেন এরপর উপকূল দিয়ে চলতে চলতে 'উসফানের নিম্ন দিয়ে পথ কাটলেন। এরপর আমাজের নিম্নদিয়ে এগিয়ে চললেন এবং কুদাইদ পার হয়ে রাস্তা কাটলেন। তারপর সান্নায়াতুল মাররাহ দিয়ে তারপরে লিক্বফ দিয়ে তার পরে লিক্বফের বিস্তৃতি ভূমি অতিক্রম করেন। তারপর হাজ্জাজের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে মিযাযের মোড় দিয়ে অতিক্রম করেন। তারপর যুল গুযওয়াইনের মোড়ের শস্য শ্যামল ভূমিতে যান। তারপরে যূ কাশর মাঠে প্রবেশ করে জুদাজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজরাদে পৌঁছেন। এরপর মাদজালাহ তি'হিনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাশ দিয়ে যু সালাম অতিক্রম করেন। সেখান থেকে আবাবীদ তাপরে ফাজহ অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপরে 'আরজে অবতরণ করলেন। তারপরে রকূবার ডান পার্শ্ব দিয়ে সান্নায়াতুল 'আয়িরে গেলেন এবং রি'ম উপত্যকায় অবতরণ করেন। এরপরই কুবায় গিয়ে পৌঁছলেন।

রাসুল ﷺএর মাদীনায় প্রবেশ

জুমআর সালাত শেষে নাবী (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিরের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও প্রশংসার) গুঞ্জণ

ধবনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নিম্নের কবিতার চরণগুলো সুর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

طلع البدر علينا*من ثنيات الوداعوجب الشكر علين*ما دعا لله داعأيها
المبعوث فينا*جئت بالأمر المطاع

‘‘দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।’

‘‘কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।’

তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভূ)[1]

আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার বাসাতেই অবস্থান করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ‘উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদের্শিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজিদে নাবাবী রয়েছে।

কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দূরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চেয়েছিলেন তাঁর নানার গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) উষ্ট্রের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানের সাথে রয়েছে। এদিকে আস’আদ

বিন যুরারাহ (রাঃ) এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।[2]

সহীহুল বুখারী শরীফে আদাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'কোন্ লোকের বাড়ি আমার থেকে নিকটে''?

আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজা।'

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) দুজনকেই সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।[3]

কিছুদিন পর নাবী পত্নী উম্মুল মু'মিনীন সওদা (রাঃ) এবং নাবী তনয়া ফাত্বিমাহ (রাঃ) ও উম্মুল কুলসুম (রাঃ) এবং উসামা বিন যায়দ (রাঃ) ও উম্মু আয়মান (রাঃ) মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। এদের সকলকে আব্দুল্লাহ বিন আবূ বাকর (রাঃ)- আবূ বকরের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে 'আয়িশাহও ছিলেন- নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য নাবী তনয়া যায়নাব (রাঃ), আবুল আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পরে এসেছিলেন।[4]

'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় পৌঁছার পর আবূ বাকর (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আববাজান! আপনি কেমন আছেন? তারপরে বিলালকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি কেমন আছেন? তিনি অর্থাৎ 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যখন আবূ বাকর (রাঃ)-এর জ্বর আসত তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করতেন,

كل امرئ مُصَبَّحٌ في أهله ** والموت أدنى من شِرَاك نَعْلِه

অর্থঃ প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী।

বিলালের অবস্থা যখন একটু সুস্থ থাকত তখন তিনি নিজের দুঃখপূর্ণ স্বর উঁচু করে বলতেনঃ

ألا ليت شِعْرِى هل أبيتَنَّ ليلة ** بوَادٍ وحولى إذْخِرٌ وجَلِيْلُ

وهل أردْن يومًا مياه مِجَنَّة ** وهل يَبْدُوَنْ لى شامة وطَفِيْلُ

‘হায় যদি আমি জানতাম যে, আমার কোন একরাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) এবং আমার পাশে ইযখির ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোন দিন কি মাজিন্না ঝর্ণাতে অবতরণ করতে পারব এবং আমি সামা ও তুফাইল পাহাড় দেখতে পাব?’

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এ প্রলাপের সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন,

[اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفَة].

‘‘হে আল্লাহ, আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার ‘সা’’ ও ‘মুদ্দে’ (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহফাহ’য় পৌঁছিয়ে দাও।[5] আল্লাহ তাঁর দু‘আ শুনলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

এখান পর্যন্ত পবিত্র জীবনের এক প্রকার ও ইসলামী দাওয়াতের এক যুগ অর্থাৎ মক্কী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমরা এখন তাঁর মাদানী জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। আল্লাহ তা’আলা তাওফীক দাতা।

রাসুল ﷺএর মাদানী জীবন

রাসুল সা এর মদীনার জীবনে দাওয়াত ও জিহাদের স্তরসমুহ:

মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রথম পর্যায়ঃ ইসলামী সমাজ নির্মাণের ও ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠালাভের যুগ। এ পর্যায়ে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাহির থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালিয়েছে যাতে মদীনায় ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যুল ক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়াহর সন্ধিতে।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতে পারে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ঃ এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলেদলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায় বিভিন্ন জাতি ও গোত্রসমূহের মুখপাত্রগণের মদীনায় আগমনের পর্যায়।

প্রথম পর্যায়:

নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করে প্রথম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসের ১২ই তারীখে জুমআর দিন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে বনী নাজ্জার গোত্রের আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'ইন-শা-আল্লাহ এটাই হবে আমার অবস্থান।' তারপর তিনি আবূ আইউব আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তর হয়ে যান।

মসজিদে নববীর নির্মান

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম কাজ হল মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ। আর এজন্য ঐ স্থানটিই নির্ধারিত হল যেখানে সর্ব প্রথম তাঁর উটটি বসে পড়েছিল। এ স্থানটির মালিক ছিল দু'জন অনাথ বালক। তিনি ঐ স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন,

[اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخرة ** فاغْفِرْ للأنصار والمُهَاجِرَة]

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালেরই জীবন। অতএব আনসার ও মহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন।'

অধিকন্তু এ কথাও বলছিলেন,

[هذا الحِمَالُ لا حِمَال خَيْبَر ** هـذا أبَـرُّ رَبَّنَا وأطْـهَر]

অর্থঃ 'এটা খায়বারের বোঝা নয়, এ আমার প্রভূর পক্ষ হতে অধিক পুণ্যময় ও পবিত্র।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মধারা সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করছিল। কাজে তারাও বলছিলেন,

لئن قَعَـدْنا والنبي يَعْمَل ** لـذاك مِـنَّا العَمَـلُ المُضَلَّل

অর্থঃ 'যদি আমরা বসে থাকি এবং নাবী (সাঃ) কাজ করেন, তাবে আমাদের এ কাজ হবে পথভ্রষ্টতার''।

এ জমিতে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক কবর ছিল। কিছু অংশ পতিত ছিল। তাছাড়া খেজুর ও গারকাদের কয়েকটি গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেন, অসমতল জায়গাটা সমতল করলেন এবং খেজুর ও অন্য গাছগুলো কাটিয়ে ক্বিবলাহর দিকে খাড়া করে দিলেন। সে সময় ক্বিবলাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস। দরজার দু'বাহুর স্তম্ভগুলো পাথর দ্বারা এবং দেওয়াল নির্মিত হল কাঁচা ইট দিয়ে। ছাদের উপর খেজুরের ডালপালা চাপিয়ে আবরণ তৈরি করা হল আর খেজুর

গাছের গুড়ি দিয়ে থাম তৈরি করা হল। মেঝেতে বিছানো হল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। ঘরের তিন দরজা লাগানো হয়েছিল। ক্বিবলাহর দেওয়াল হতে পিছনের দেওয়াল পর্যন্ত দৈর্ঘ ছিল ১০০ (একশত) হাত আর প্রস্থও ছিল ঐ পরিমাণ অথবা কিছু কম। ভিতরে গভীরতা ছিল তিন হাত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন যার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুরের গুঁড়ির বর্গা দিয়ে। ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে তৈরি। এগুলো ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন নাবী পত্নীগণের (রাঃ) আবাস কক্ষ। এ কক্ষগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাসা থেকে এ আবাসস্থানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।[1]

মসজিদে নাবাবী শুধুমাত্র সালাত আদায়ের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের উৎসস্থল। এ মসজিদেই ছিল মুসলিম সামাজের আদিশিক্ষা কেন্দ্র যেখানে বসে মুসলিমগণ ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাদিক্ষা এবং হেদায়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন, এ মসজিদেই ছিল এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে জাহেলিয়াত জীবনের দীর্ঘ কালের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা হয়েছিল, এ মসজিদেই বসত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শ সভা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ মসজিদে নাবাবী। অধিকন্তু, এ মসজিদেই ছিল অনেক নিবেদিত সাহাবী (রাঃ)-এর আবাসস্থল, যাঁদের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে কিছুই ছিল না।

হিজরতের প্রথম দিকেই আযান প্রথা প্রচলিত হয়। এটা এমন এক সুরেলা স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনের জন্য এমন মনোজ্ঞ আহবান যা প্রত্যহ পাঁচবার প্রচারিত হয় মসজিদের মিনার থেকে। মসজিদে নাবাবীতে যখন আযান দেয়া হতো এবং আযানের গুরু গম্ভীর আওয়াজ যখন আকাশের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত, তখন একদিকে আল্লাহ প্রেমিক মুসলিমদের অন্তর ভালবাসায়, ভক্তিতে, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠত, অন্যদিকে কাফির মুশরিকদের

অন্তর ভয়-ভীতিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠত। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন যায়দ বিন আবদে রাব্বিহীর (রাঃ) স্বপ্নের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে (বিস্তারিত অবগতির জন্য জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমাদ ও সহীহুল ইবনে খুযায়মাহ'য় দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।)

ইহুদিদের সাথে চুক্তিস্থাপন:

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নাবী কারীম (সাঃ) যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। এ লক্ষ্যে উদার উন্মুক্ত মনমানসিকতা নিয়ে এমন সব নিয়ম নীতি ও কার্যক্রম তিনি অবলম্বন করলেন যে, ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতা-ক্লিষ্ট সম সাময়িক সমাজে যা ছিল একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানাবী (সাঃ)-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও প্রকাশ্য কলহ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার হাবভাবও প্রকাশ করে নি। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ, মালক্রোক এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল যার উল্লেখ কিছু পূর্বে করা হয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১. বনু আওফের ইহুদীগণ মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে একই উম্মতের মতো থাকবে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এটা তাদের নিজেদের অধিকার হিসেবে যেমন গণ্য হবে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের এবং তাদের দাসদাসীদের বেলায়ও গণ্য হবে। বনু আউফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

২. মুসলিম এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ আয়-উপার্জনের যিম্মাদার থাকবে।

৩. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে অন্য কোন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৪. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে, কোন অন্যায়-অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়।

৫. মিত্র পক্ষের অন্যায়-অনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৬. কেউ কারো উপর জুলুম করলে মজলুমকে সাহায্য করা হবে।

৭. চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যত দিন চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীদেরকেও মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে।

৮. এ চুক্তিভুক্ত সকলের জন্যই মদীনায় কোন প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।

৯. চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো কোন নতুন সমস্যা কিংবা ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলে এর মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)।

১০. কুরাইশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না।

১১. ইয়াসরিবের উপর কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে তা প্রতিহত করতে হবে।

১২. কোন অন্যায়কারী কিংবা পাপীর জন্য এ চুক্তি সহায়ক হবে না।

এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদীনা এবং সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক শান্তি-স্বস্তিময় সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে যার রাজধানী ছিল মদীনা এবং সর্বময় নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। এ সাম্রাজ্য পরিচালনের ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়।

সুশৃঙ্খল এবং শান্তি-স্বস্তিময় অঞ্চলের সীমারেখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নাবী কারীম (সাঃ) পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সব চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মুসলমানদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধের ঘোষণা:

এরপর সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন এবং উমাইয়া ইবনু খালফের অতিথি হন। তিনি উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার জন্য এমন এক সময়ের ব্যবস্থা করে দাও যখন আমি নির্জনে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করতে পারি। সেই মোতাবেক উমাইয়া খরতপ্ত দুপুরে তাকে নিয়ে পথে বের হলে পথে আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, 'হে আবূ সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে?'

উত্তরে উমাইয়া বলল, 'এ হচ্ছে সা'দ (রাঃ)।'

আবূ জাহল তখন সা'দ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি দেখছি যে, তুমি বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করতে রয়েছ, অথচ তোমরা বেদ্বীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবূ সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

তার একথা শুনে সা'দ (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমার এমন কাজে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব যা তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হবে মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথটি।

যুদ্ধের অনুমতি :

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ) [الحج: 39].

'' যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' (আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

তারপর এ ধরণের আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে বলে দেয়া হয় যে, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছেঃ

(الَّذِيْنَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُمُوْرِ) [الحج: 41]

“(এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।’ (আল-হাজ্জ ২২ : ৪১)

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হলও তা শুধু কুরাইশদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অনুমতির বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তা ওয়াজিবের স্তর বা পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এ নির্দেশ কুরাইশ ব্যতিত অন্যাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। এ সব ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে এসব স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি :

১. মক্কার কুরাইশ মুশরিকদেরকে যুদ্ধরত গণ্য করা। কেননা তারাই প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সাথে সাথে মক্কার অন্যান্য মুশরিক ব্যতিত কেবল তাদের ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করাও জরুরি হয়ে পড়ে।

২. ওদের সাথে যুদ্ধ করা যারা আরবের সকল মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত ও একত্রিত হয়। অনুরূপ কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠী যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

৩. সে সব ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খিয়ানত করেছে এবং মুশরিকদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

৪. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা (যেমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) যতক্ষণ তারা বিনীত হয়ে যিজিয়া কর না দেয়।

৫. মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা । ইসলামের হদ ব্যতীত তাকে কিছু করা যাবেনা। তার বাকী হিসাব আল্লাহর হাতে।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হল, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হল ওটা যেহেতু শুধু কুরাইশদেরই শক্তিমত্ততা ও একগুঁয়েমির ফল ছিল সেহেতু এটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ যে মুসলিমগণ নিজেদের দখল সীমা কুরাইশদের ঐ বাণিজ্য পথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এ কারণেই দখল সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে :

১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এ রাজপথ হতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২. এ রাজপথের উপর টহলদারী দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ঐ ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তিটির বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদীনা থেকে তিন মনজিলের অধিক অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবাসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদারী সৈন্যদের পরিভ্রমণ কালে লোকজনদের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বদরযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন সারিয়াহ ও গাযওয়া সমুহ:

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ায় এ দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতার কাজ শুরু হয়ে যায়। পরিভ্রমণকারী প্রহরীরূপে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে টহল দিতে শুরু করেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আভাষ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের এ টহলদারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশ-পাশের পথসমূহের উপর সাধারণভাবে এবং মক্কা থেকে আগত

পথগুলোর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এভাবে বিভিন্ন পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং একই সঙ্গে এ সকল পথের আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করা। অধিকন্তু, এ সুসংগঠিত টহলদারীর অন্য যে একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে ইয়াসরিবের ইহুদী, মুশরিক এবং বেদুঈনদের অন্তরে এ ধারণাটি বদ্ধমূল করা যে, মুসলিমগণ এখন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পূর্বের নাজুক অবস্থাকে পেছনে ফেলে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাছাড়া কুরাইশ মুশরিকগণকে তাদের অর্থহীন ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়াবেগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যাতে এখনো তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার অন্ধকূপে যে পতিত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনার আলোকোজ্জ্বল পথে পদচারণা শুরুর মাধ্যমে নিজেদের আয় উপার্জন ও জীবন-জীবিকার পথে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে সন্ধির কথাটা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে এবং মুসলিমদের আবাসস্থানের উপর চড়াও হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলার যে চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে, আল্লাহর দ্বীনের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে ও মক্কার মুসলিমদের উপর যে অমানবিক নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে সে সব থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি, মুসলিমগণ যাতে আরব উপদ্বীপে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

১। সারিয়্যাতুসীফিল বাহর বা সমদ্রু োপকূলের প্রেরিত বাহিনী

২. সারিয়্যাতুরাবিগ বা রাবিগ অভিযান

৩. সারীয়্যায়ে খার্রার

৪. গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান

৫. গাযওয়ায়ে বওয়াত ু বা বওয়া ু তের অভিযান

৬. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান

৭. গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহ

৮. নাখলাহ অভিযান

গাযওয়ায়ে বদর(ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ):

- **যুদ্ধের কারণ:**

গাযওয়ায়ে উশায়রার আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, একটি কুরাইশ কাফেলা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'র পাকড়াও হতে বেঁচে গিয়েছিল। এ কাফেলাটি যখন সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল তখন নাবী কারীম (সাঃ) ত্বালহাহ ইবনু উবাইদিল্লাহ (রাঃ) এবং সাইদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। এ সাহাবীদ্বয় (রাঃ) 'হাওরা' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখানে অপেক্ষমান থাকেন। আবূ সুফইয়ান যখন কাফেলাটি নিয়ে ঐ স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন সাহবীদ্বয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিষয়টি অবহিত করেন।

এ কাফেলায় মক্কাবাসীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এক হাজার উট ছিল এবং এ উটগুলো কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মালপত্র বহন করছিল। শুধুমাত্র এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাফেলার সঙ্গে চল্লিশ জন কর্মী ছিল।

মদীনাবাসীদের ধনদৌলত লাভের জন্য এটা ছিল অপূর্ব এক সুযোগ। পক্ষান্তরে এ বিশাল পরিমাণ ধনমাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে প্রচুর ধনমাল রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর জন্য বেরিয়ে পড়। হয়ত আল্লাহ পাক গণীমত হিসেবে এ সকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ উদ্দেশ্যে গমন কারো উপর জরুরী বলে উল্লেখ করেননি। বরং এটাকে তিনি জনগণের ইচ্ছা এবং আগ্রহের উপর ছেড়ে দেন। কেননা এ ঘোষণার সময় এটা মোটেই ধারণা করা হয়নি যে, এ কাফেলার সঙ্গে যুঝাযুঝির পরিবর্তে

শক্তিশালী কুরাইশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে ভয়াবহ এক রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের মোকাবেলা করতে হবে। আর এ কারণেই বহু সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অভিযানগুলোর মতই সাধারণ একটা কিছু হবে। আর এ কারণেই যারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও উত্থাপিত হয় নি।

- **মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ও বিন্যাস:**

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী (রাঃ)। তিন শতাধিক বলতে সে সংখ্যাটি হতে পারে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭ যাদের মধ্যে ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন ছিলেন মহাজির এবং অন্যেরা ছিলেন আনসার। আনসারদের মধ্যে আবার ৬১ জন ছিলেন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন এ রকম কোন প্রস্তুতিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাহিনীর ছিল না। এমন কি যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিন শতাধিক লোক বিশিষ্ট এ বাহিনীর জন্য মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম (রাঃ)-এর ছিল একটি এবং মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ কিনদী (রাঃ)-এর ছিল অপরটি। উট ছিল সত্তরটি, এক এক উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন দুই কিংবা তিন জন লোক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আলী (রাঃ) এবং মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ গানাভী (রাঃ)-এর জন্য বরাদ্দ ছিল একটি উট। তাঁরা তিন জন পালাক্রমে আরোহণ করতেন সেই উটটির উপর।

মদীনায় ব্যবস্থাপনা ও সালাতে ইমামত করার দায়িত্ব প্রথমে অর্পণ করা হয়েছিল ইবনু উম্মু মাকতুম (রাঃ)-এর উপর। কিন্তু 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছার পর নাবী কারীম (রাঃ) আবূ লুবাবাহ ইবনু আবদিল মুনযির (রাঃ)-কে মদীনার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আসে যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার কথা। সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুস'আব ইবনু 'উমায়ের (রাঃ)-কে। এ পতাকার রঙ ছিল সাদা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন :

১। মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় আলী ইবনু আবী (রাঃ) তালেবকে। যাকে ইক্কাব বলা হয়।

২। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-কে। এ দুটি পতাকা ছিল কালো বর্ণের।

সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম (রাঃ)-কে এবং বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিক্বদাদ ইবনু 'আমর (রাঃ)-কে। কারণ, সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র এ দুজনই ছিলেন অশ্বারোহী। সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের দলপতি নিযুক্ত হন ক্বায়স ইবনু আবী সা'সা'আহ (রাঃ) আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তম প্রস্তুতিবিহীন সেনাবাহিনী নিয়েই অগ্রযাত্রা শুরু করেন। তাঁর বাহিনী মদীনার মুখ হতে বের হয়ে মক্কাগামী সাধারণ রাজপথ ধরে চলতে থাকেন এবং 'বি'রে রাওহা' গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বাম দিকে মক্কাগমী রাজপথ ছেড়ে দেন এবং ডান দিকের পথ ধরে চলতে থাকেন। চলার এক পর্যায়ে 'নাযিয়াহ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন (গন্তব্য স্থল ছিল বদর)। তারপর নাযিয়ার এক প্রান্ত দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'রাহকান' উপত্যকা অতিক্রম করেন। এটা হচ্ছে 'নাযিয়াহ' ও 'দাররার' মাঝে একটি উপত্যকা দিয়ে গমণ করেন। তারপর 'দাররাহ' থেকে নেমে সাফরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। সেখান হতে 'জুহাইনা' গোত্রের দুজন লোককে যথা বাবীস ইবনু উমার ও আদী ইবনু আবী যাগবাকে কুরাইশ কাফেলার অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

- **মক্কায় বিপদের ঘোষণা :**

পক্ষান্তরে কুরাইশ কাফেলার অবস্থা এই ছিল যে, এর নেতা আবূ সুফইয়ান ছিলেন সুচতুর সতর্ক এবং অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। এ প্রেক্ষিতে তিনি অব্যাহতভাবে পথের খবরাখবর নিতেই থাকতেন। পথে যে কাফেলার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হতো তাদের সকলকেই তিনি পথের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে তিনি অবগত

হতে সক্ষম হন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে কাফেলার উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি যমযম ইবনু 'আমর গিফারীকে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কা পাঠিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, 'কাফেলা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন, হিফাযতের জন্য সাহায্যের আশু প্রয়োজন।' যমযম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মক্কায় আসে এবং আরব সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের নাক চাপড়ালো, হাওদা উলটালো, জামা ছিঁড়ে ফেলল, মক্কা উপত্যাকায় উটের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকল, 'হে কুরাইশগণ! কাফেলা (আক্রান্ত কাফেলা, আক্রান্ত আবূ সুফইয়ানের সঙ্গে তোমাদের ধনমাল রয়েছে, তার উপর আক্রমণ চালানোর জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তার সাহাবীরা উদ্যত হয়েছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, তোমরা তা পাবে। অতএব, সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।')

- **মক্কাবাসীর যুদ্ধপ্রস্তুতি:**

কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে সমগ্র মক্কা উপত্যকায় একদম হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে সকলে দৌঁড়ে এসে বলতে থাকল, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তার সঙ্গী সাথীরা কি মনে করেছে যে, এ কাফেলাও ইবনু হাযরামীর কাফেলার মতই? না, না, কখনই না। আল্লাহর শপথ! এ কখনই সেরূপ নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যে, আমাদের ব্যাপারটি অন্য রকম।'

সমগ্র মক্কা শহরে তখন দু'শ্রেণীর লোক চোখে পড়ছিল। এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ গমন করছিল এবং অন্যদল নিজের পরিবর্তে অন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করছিল। আর এভাবে প্রায় সবাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে মক্কার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেউই পিছনে ছিলেন না। শুধু আবূ লাহাব নিজে না এসে তার একজন ঋণী ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। আশে-পাশে অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকেও তারা দিজেদের দলভুক্ত করে নিল। কুরাইশ গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ছাড়া আর কোন গোত্রই পিছনে রইল না। বনু আদী গোত্রের কোন লোকই এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল না।

- **মক্কা সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা:**

সুরাক্বাহ ইবনু মালিকরূপী অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান বনু কিনানাহর ব্যাপারে জামিন হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় কুরাইশগণ আশঙ্কামুক্ত হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা যেমনটি বলেন,

)بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ( ]الأنفال:47[

''তারা শক্তিমত্তায় গর্বিত হয়ে জনগণকে (নিজেদের শক্তিমত্তা) দেখাতে দেখাতে আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হলো।' (আল-আনফাল ৮ : ৪৭)

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমনটি বলেছেন, 'নিজেদের ক্ষুরধার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার ও আত্ম-অহমিকার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এ বলে যুদ্ধে বেরিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাথীগণ মক্কাবাসীগণের ব্যবসায়ী দলের উপর চক্ষুত্তোলনের হিম্মত পেল কোথায় থেকে?'

মক্কা বাহিনী খুব দ্রুত গতিতে উত্তর মুখে বদর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তারা উসফান ও কুদায়েদ উপত্যকা অতিক্রম করে যখন জুহফা নামক স্থানে উপস্থিত হল তখন আবূ সুফইয়ানের লোক এসে সংবাদ দিল যে, 'কাফেলা নিরাপদে চলে এসেছে সুতরাং সামনে আর অগ্রসর না হয়ে এখন ফিরে যাওয়ার পালা।'

- **বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**

এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীরযোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহবান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ'তে মুআয ও মু'আবিবম বিন আফরা কিশোর দুই ভাই ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তিনজন আনছার তরুণ যুবক বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও'।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী আহকে এক নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী'আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ'লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে

এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন। প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীরযোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় আল্লাহর রাসূল (সা) আল্লাহর নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি।... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ'লে আজকের দিনের পরে তোমার ইবাদত করার মত কেউ আর ভূপৃষ্ঠে থাকবে না'। তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে তার চাদর উঠিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে রাসূল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন'। এ সময় আয়াত নাযিল হল- 'যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করলেন। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা হবে ধারাবাহিক ভাবে অবতরণকারী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, আবুবকর! সুসংবাদ নাও। আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুসলিম বাহিনীর এই হামলার প্রচন্ডতার সাথে সাথে যোগ হয় ফেরেশতাগণের হামলা। ইকরিমা বিন আবু জাহল বলেন, ঐদিন আমাদের লোকদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়ে যেতো, অথচ দেখা যেতো না কে মারলো। আবু দাউদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল'। রাসূলের চাচা আববাস যিনি বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনছার তাকে বন্দী করে আনলে, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনছার বললেন, হে রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত আনছারকে বললেন, চুপ কর। আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন'।

মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমনে মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলে উঠলো, সোরাক্কার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা, ওয়ালীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। আনছারদের বানু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আমের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে এক টানে সেটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূলের কাছে এসে গর্বভরে বলে উঠলো হে রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كِلاَكُمَا قَتَلَهُ 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'। অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয বিন আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন আফরা হযরত উসমানের খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ গিয়ে দেখেন আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, রে বকরীর রাখাল, তুই এতদূর বেড়ে গিয়েছিস? উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় বকরীর রাখাল ছিলেন। তারপর বলল, ওহ! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষারা হত্যা না করে অন্য কেউ হত্যা করতো! এভাবে মক্কার বড় স্বাগতটা শেষ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার মৃতদেহ দেখার পর বলেন, 'আল্লাহ আফরার দুই পুত্রের উপর রহম করুন! তারা এই উম্মতের ফেরাউনকে হত্যায় অংশীদার ছিল। অন্য অংশীদার ছিলেন ফেরেশতা এবং ইবনু মাসঊদ'।

• যুদ্ধের ফলাফল:

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয়। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূপে ( )القَلِيْبনিক্ষেপ করা হয়। তাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহল সহ ১৪ নেতার ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুতব'ইম ও হাকীম বিন হেযাম পরে মুসলমান হন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সব মাল তার নিকটে জমা করতে বলেন। অতঃপর বদর থেকে রওয়ানা দিয়ে ছাফরা ( )الصفراءগিরি সংকট অতিক্রম করে একটি টিলার উপরে গিয়ে বিশ্রাম করেন এবং সেখানে বসে গনীমতের সমস্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন।

রাসূল (সা)- এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং সাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান। কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল।

সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করতে পারেন এবং তারা আমাদের জন্য সাহায্যকারী হ'তে পারে। কিন্তু উমর ফারুক (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দেন। আবুল 'আছ সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন। আবুল 'আস ছিল খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল কন্যা যয়নবের স্বামী। কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূলের আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে নযীর বিহীন।

- **উহুদের যুদ্ধ**

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যখন আবু জাহেলসহ কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করলেন তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করল। দায়িত্ব পেয়ে রাসূল (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র ও জনবলসহ সে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের নিকট তাবু স্থাপন করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে মদ্বীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যুবকরাও এবার নিজেদেরকে

যুদ্ধের জন্য পেশ করে। যারা বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরাবা বিন আওয়াস। আর যাদেরকে জিহাদ করতে সক্ষম মনে করেছেন, তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সামুরা বিন জুন্দুব এবং রা এদের বয়স ছিল তখন ১৫ বছর। কেউ কেউ বলেছেন- যাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন ১৫ ক 80/113 কারণে তাদেরকে বালেগ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। আর যাদের বয়স এর কম ছিল নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

অন্য একদল আলেম বলেন- ১৫ বছর বয়স বা বালেগ হওয়ার কারণে নয়, বরং যাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত শক্তি দেখেছেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন শক্তি না থাকার কারণেই তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীছের কতক শব্দে এসেছে যে, রাসূল (সা) যখন আমাকে শক্তিশালী দেখলেন তখন জিহাদের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক নবী (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি মদ্বীনা থেকে বের হয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করবেন? না মদিনায় থেকেই যুদ্ধ করবেন? রাসূল (সা)-এর রায় ছিল যে, মুসলমানেরা মদিনা থেকে বের হবেনা; বরং মদিনার ভিতরেই থাকবে। কাফেররা যদি মদিনায় প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করে তাহলে মুসলমানেরা মদিনার প্রবেশ পথে যুদ্ধ করবে এবং মহিলারাও ঘরের ছাদ থেকে কাফেরদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই মতকেই সমর্থন করল। আর এটিই ছিল সঠিক রায়। কিন্তু যে সমস্ত সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদ্বীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে পড়লেন। যারা বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবার তাদের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ল। তখন তারা বলল- আমরা আল্লাহর রসূলকে বের হতে বাধ্য করলাম! তারা আরও বলল- হে

আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মদিনায় অবস্থান করতে চান তাহলে তাই করুন। রাসূল (সা) তখন বললেন- যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর কোন নাবীর জন্য এটা জায়েয নয় যে, তাঁর মাঝে এবং শত্রুর মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলবে।

তাই নবী (সা) এক হাজার সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদিনায় অবশিষ্ট মুসলমানদের ইমাম নিযুক্ত করলেন। এর আগে মদিনায় থাকার সময় রাসূল (সা) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর তলোয়ারটি সামান্য ভেঙ্গে গেছে, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন- তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পরিবারের একজন লোক আক্রান্ত হবেন, গাভী যবেহ করার ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিহত হবেন আর সুরক্ষিত দূর্গ হচ্ছে মদিনা। তিনি পবিত্র জুআর দিন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মদিনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল। অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর উপর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। এমন কি তারা যদি দেখে পাখীরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই বাহিনীকে পিছনে নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে মুশরিকরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

ঐ দিকে কুরাইশরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে ছিল দুইশত অশ্বারোহী যোদ্ধা। দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। আল্লাহর দুশমনেরা পরাজিত হল। তারা পরাজিত হয়ে তাদের মহিলাদের নিকট আশ্রয় নিতে লাগল। ঐ দিকে রাসূল (সা)

কর্তৃক নিয়োজিত ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী যখন কাফেরদের পরাজয় দেখল তখন তারা রাসূল (সা) এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করতে লাগল এবং গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল।

তাদের আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রসূল (সা) এর আদেশের কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলনা। তাদের ধারণা ছিল মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সুতরাং রাসূল (সা) এর আদেশের কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। তাই তারা স্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐ দিকে মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পিছন দিক থালি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। এখানে ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা পলায়ন করলে মুশরিকরা রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুশরিকরা তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। এ সময় শয়তান উচ্চস্বরে চিৎকার করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই কথা শুনে মুসলিমগণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। আনাস বিন নযর তখন মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?। তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দা আমি উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূল (সা) মুসলমানদের সামনে আগমণ করলেন। কাব বিন মালেকই সর্বপ্রথম তাঁকে হিলমেটের নীচ থেকে চিনে ফেললেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হে মুসলিমগণ! এই তো আল্লাহর রসূল এসে গেছেন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

রাসূল (সা) ইংগিতের মাধ্যমে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তাঁর চতুর্পাশে এসে একত্রিত হল। সেখানে আবু বকর, উমার এবং আলী (রাঃ) ও ছিলেন।

- **খন্দকের যুদ্ধ**

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, ইহুদীরা যখন দেখল যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করেছে ও মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং তারা শুনতে পেল যে, আগামী বছর আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। সুতরাং ইহুদী নেতারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমণ করল। তারা মক্কায় গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এবং রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করল। ইহুদীদের আগ্রহ দেখে কুরাইশদের হিম্মত ও সাহস বেড়ে গেল। ইহুদীদের পরামর্শ মুতাবেক তারা রণপ্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে তারা গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট গমণ করল। তারা তাদেরকে মুহাম্মাদ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাল। তারা সেই ডাকে সাড়া প্রদান করল।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। এদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ প্রস্তুতি সহ তারা মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। সংবাদ পেয়ে নবী (সা) সালমান ফারসীর পরামর্শে মদিনার চার পার্শে খন্দক তথা পরীখা খননের পর তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনার মূল শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফিকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী মদিনার নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে মদিনাকে ঘেরাও করে ফেলল। পূর্ণ

একমাস তারা কঠোরভাবে মদিনাকে অবরোধ করে রাখল। মুশরিক ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানে খন্দক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কোন প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের উপর বিরাট এক বাতাস প্রেরণ করলেন। প্রচন্ড বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। এতে করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করল। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৈনিকদেরকে বিজয় দান করলেন এবং দুশমনদেরকে একাই পরাজিত করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি :

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নবী (সা) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায় পাঠালেন। উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাকে কাবার কাছেই পৌঁছতে দিবেনা এবং তাঁর সাথে তারা প্রচন্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। নবী (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর (রাঃ) এর পরামর্শ ছিল, কুরাইশদেরকে কোন প্রকার ছাড় দেয়া যাবেনা। তারা যদি রাস্তায় আটকিয়ে দেয়, তাহলে প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। রাসূল (সা) আবু বকরের এই মতকেই পছন্দ করলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নবী (সা) উসমান (রাঃ) কে এই খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসছি না। উমরাহ পালন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কুরাইশরা এই কথার মোটেই মূল্যায়ন করলনা। তারা বলল- আমরা তোমার কথা শুনলাম। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। উভয় পক্ষের লোকেরা পরস্পর তীর ও পাথর নিক্ষেপে লিপ্ত হল। এই পর্যায়ে নবী (সা) এর কাছে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশরা উসমান (রাঃ) কে হত্যা করে ফেলেছে।

মুসলমানেরা এই খবর শুনে রাগান্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রাসূল (সা) এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদিনায় ফেরত যাবেন না। কিন্তু একটু পরেই সহীহ-সালামতে উসমান (রাঃ) মক্কা হতে ফেরত আসলেন। উসমান (রাঃ) এর আগমণে পরিস্থিতি শান্ত হল। পুনরায় নতুন করে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নে বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি রচিত হল। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

খায়বারের যুদ্ধ:

মুসা বিন উকবা বলেন- হুদায়বিয়া থেকে ফেরত এসে নবী (সা) ২০ দিন বা এর চেয়ে কম সময় মদিনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় তিনি সিবা বিন উরফুযাকে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ সময় আবু হুরায়রা (রাঃ) মদিনায় আগমণ করে ফজরের সলাতে সিবা বিন উরফুযার সাথে সাক্ষাত করলেন। সিবা বিন উরফুযাকে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুতাফফিফীন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি সলাতেই বলতে শুরু করলেন। উমুক ব্যক্তির জন্য সর্বনাশ হোক! তার নিকট রয়েছে দু'টি দাঁড়িপাল্লা। সে যখন মানুষকে কোন কিছু মেপে দেয়, তখন ছোট পাল্লা দিয়ে মেপে দেয়। আর যখন মেপে নেয় তখন বড়টি দিয়ে নেয়। সলাত শেষে তিনি সিবা-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) খায়বারে গিয়ে নবী (সা)-এর সাথে মিলিত হলেন। নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলায় তারা আবু হুরায়রা ও তাঁর সাথীদেরকে মালে গণীমতের অংশ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিও গণীমতের অংশ পেলেন।

নবী (সা) খায়বারে গিয়ে ফজরের সলাত পড়লেন। সলাতের পর মুসলমানগণ আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নাবী (সা) এর আক্রমণের খবর যেহেতু তাদের জানা ছিল না, তাই তারা সকাল বেলা তাদের চাষাবাদের জমির দিকে বের হচ্ছিল। তারা মুসলিম

বাহিনীকে দেখে বলল- আল্লাহর শপথ! এই তো মুহাম্মাদ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। এই বলে তারা নিজেদের দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নবী (সা) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার! খায়বার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন সকাল বেলা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। অতঃপর নবী (সা) আলীকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর লেখক মারহাব নামক ইহুদীর সাথে আলী (রাঃ) এর লড়াইয়ের বর্ণনা এবং আমের বিন আকওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আলী (রাঃ) মারহাবকে হত্যা করেছেন।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী খায়বারবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় যখন তারা খাওয়ার জন্য গৃহপালিত গাধা যবেহ করল তখন রাসূল (সা) তাদেরকে গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করলেন।

পরিশেষে তাদের সাথে এই শর্তে মীমাংসার চুক্তি করলেন যে, তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যতীত যত ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য রাসূল (সা) এর জন্য রেখে যেতে হবে। আর শর্ত করা হল যে, কেউ যদি কোন কিছু গোপন করে কিংবা লুকিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নবী (সা) হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নবী (সা) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নবী (সা) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাঃ) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাঃ) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন, তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে

ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন উপরোক্ত শর্তে তাদেরকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বলল- এই শর্তে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নিব আর আপনি বাকী অর্ধেক নিবেন। ঐ দিকে রাসূল (সা) এর কাছে কাজ করার মত কোন লোক ছিলনা। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। ইহুদীরা খায়বারে কত দিন থাকতে পারবে? চুক্তিতে এটি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ ছিলনা; বরং বিষয়টি রাসূল (সা)এর ইচ্ছার উপর দেয়া হয়েছিল। যত দিন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দিবেন।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি তাদের কাউকেই হত্যা করেন নি। তবে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী।

রাসূল (সা) সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্দী করলেন। তিনি আবুল হুকাইকের এক পুত্রের বিবাহধীন ছিলেন। নবী (সা) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। মুক্ত করে দেয়াটাই বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করলেন।

খায়বারের ভূমিকে রাসূল (সা) ৩৬ ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার ১০০ ভাগে ভাগ করে মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করলেন। এখান থেকে রাসূল (সা) এবং মুসলমানগণ অর্ধেক অর্থাৎ ১৮০০ অংশ নিলেন। আর বাকী অংশগুলো তথা ১৮০০ অংশ সেখানকার যমীন দেখা-শুনাকারী এবং বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন- খায়বারের যমীন মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কারণ হল সেখানকার এক অংশ জয় করা হয়েছিল যুদ্ধ করে আরেক অংশ জয় করা হয়েছিল সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে। যেই অংশ লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল, তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর যেই অংশ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত

হয়েছিল, তা খায়বারের যমীন দেখা-শুনাকারীদের জন্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে রেখে দেয়া হয়েছিল।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে খায়বারের সকল অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল। এটিই সঠিক ও সন্দেহাতীত কথা।

মুতাহর যুদ্ধ

মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল উলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান। মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করার পর এবং হুদায়বিয়াতে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতাহ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা উমার (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়। যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের অত্র বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর ছিল প্রায় ২ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'ভা (৩০) নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর তিনজন সেনাপতি শহীদ হ'লে সকলের পরামর্শে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এই বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (সা) বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয়, তবে তার খুলে জাফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে নিহত হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। বস্তুতঃ এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম।

মুসলিম বাহিনী শামের মা'আন অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা হঠাৎ জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এসময় এক লাখ সৈন্য নিয়ে শামের বালক্বা অঞ্চলের মাআবে অবস্থান করছেন। সেখানে তার সাথে যোগ হয়েছে লাথাম, জুযাম, কাইন, বাহরা ও বালী প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের আরো এক লাখ যোদ্ধা। অভাবিতভাবে বিরোধী পক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অতঃপর পরামর্শ সভায় বসেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের মত। যেখানে পূর্ব থেকে কেউ জানতেন না যে, তারা এত বড় একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের সম্মুখীন হবেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকটে শত্রু সংখ্যার খবর দিয়ে পত্র লিখি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবেন অথবা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিবেন, তাই করব। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে আমার কওমা আল্লাহর কসম! তোমরা যেটাকে অপছন্দ কর, নিশ্চয় তোমরা সেটা অন্বেষণের জন্যই বের হয়েছ। আর তা হ'ল 'শাহাদাত'। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা সংখ্যা দ্বারা, শক্তি দ্বারা বা আধিক্য দ্বারা। আর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করিনা কেবলমাত্র এই দ্বীনের স্বার্থ ব্যতীত। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে বাড়ুন। নিশ্চয় এর মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি কল্যাণের একটি রয়েছে। হয় বিজয় নয় শাহাদাত। অতঃপর সকলে বললেন- অবশ্যই, আল্লাহর কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছেন'। অতঃপর সকলে নতুন উদ্দীপনায় স্রেফ আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং দু'দিন পর যুদ্ধে রওয়ানা হন ও মুতা (৩০) নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। অতঃপর তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে নেন। এসময় তাঁর ঘোড়া শাকরা নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝান্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝান্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ

বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান। তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব, অভূতপূর্ব নিখাদ শাহাদাতপ্রিয়তা, খালিদের অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় স এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা। 93/113 একা খালিদ বিন ওয়ালীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল, তাতে অনুমান করা চলে কত সেপ্য তাপের ক্ষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল 'খন্দক' যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

মক্কা বিজয়:

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) মদীনা হতে রওয়ানা হল এবং ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহুম কুলধূম বিন হোসায়েন আল-গেফারী। এটি ছিল একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর রাসূল (সা)-এর সত্যতার ব্যাপারে সমগ্র আরব বিশ্বে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বে কা'বাগৃহের উপর কর্তৃত্বের কারণে মানুষ কুরাইশ নেতাদের প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য পোষণ করত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল (সা) তাদের কারো প্রতি কোনরুপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'।

দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাজার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাজার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখন মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। টু শব্দটি করার সাহস কারো হল না। নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী। কা'বাগৃহ হল মূর্তিশূন্য। 'উয্যার বদলে শুরু হল আল্লাহর জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস।

এরপর নবী কারীম (সাঃ) ভিতর থেকে কা'বাহ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল (রাঃ) ভিতরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে খেমে যান। এ অবস্থায় নবী কারীম (সাঃ)-এর বাম পাশে থাকে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি। ঐ সময়ে কা'বাহ ঘরটি ছিল ছয় স্তম্ভবিশিষ্ট। অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) সেখানেই সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশগুলো তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাকবীর ও একত্ববাদের আয়াতগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর কা'বা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কা'বাহ ঘরের সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিল। দরজার দু' অংশ ধারণ করে নিম্নভাগে দন্ডায়মান কুরাইশদের সম্বোধন করে নবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি একক ভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানো সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান, অথবা পূর্ণতা অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দুই পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ)-এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি।' এরপর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন-

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি এবং সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জ্ঞাত আছেন এবং সব খবর রাখেন। [আল-হুজুরাত (৪৯): ১৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। আলী (রাঃ) বলেছেন, 'যার হাতে চাবি ছিল তিনি নবীজী (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হুজুর! আমাদের জন্য হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানের সহিত কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মানও একই সঙ্গে প্রদান করুন।' আল্লাহ আপনার উপর রহম করুক। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক এ আরযটি আব্বাস (রাঃ) করেছিলেন। অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) বললেন, উসমান বিন জ্বালহাহ কোথায়? তাঁকে ডাকা হলে নবী কারীম (সাঃ) বললেন, উসমান! এ নাও তোমার চাবি। অদ্য পুণ্য এবং ওয়াদা পূরণের দিন। তাবাকাত ইবনু সা'দ (রাঃ)- এর বর্ণনায় আছে যে, চাবি দেয়ার সময় নবী কারীম (সাঃ) আরও বলেছিলেন,

'সর্বক্ষণের জন্যই তুমি এ চাবি গ্রহণ কর। তোমার নিকট থেকে এ চাবি সেই ছিনিয়ে নিবে যে অত্যাচারী হবে। উসমানা আল্লাহ নিজ ঘরের জন্য তোমাকে বিশ্বাসভাজন করেছেন। অতএব, আল্লাহর এ ঘরে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তুমি যা পাবে তা ভোগ করবে।'

হুনাইনের যুদ্ধ:

ইবনে ইসহাক বলেন- হাওয়ায়েন গোত্র যখন মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেল তখন মালেক বিন আওয়ফ হাওয়াযেন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করল।

তার সাথে ছাকীফ, জুশাম এবং অন্যান্য গোত্রও এসে যোগ দিল। তাদের মধ্যে দুরাইদ বিন সিমতা নামক একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। এই বৃদ্ধের মতই কার্যকর হত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এখানে হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই যুদ্ধের কতিপয় হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন মক্কা বিজয় হবে তখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে এবং সমস্ত আরব গোত্র রাসূল (সা) এর আনুগত্য করবে।

যখন মক্কা বিজয় পূর্ণ হল তখন হিকমতে ইলাহীর দাবী এই ছিল যে হাওয়াযেন এবং তাদের সহযোগী গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে। তাই তারা বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করে রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, তাঁর হুকুমই বিজয়ী হবে ও তাঁর রাসূল (সা) এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের থেকে অর্জিত মালে গণীমত মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বারগাহে ইলাহীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম পরিণত হবে। এই বার আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী এবং তাঁর বান্দাদেরকে এমন এক বিরাট শক্তির মাধ্যমে বিজয় দান করলেন, যা মুসলিমদের নিকট ইতিপূর্বে ছিলনা। উদ্দেশ্য হল, যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য আরব শক্তি মুসলিমদের মুকাবেলা করতে ভয় পায়।

আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবী এই ছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্বেও তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদেরকে পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করালেন।

এর মাধ্যমে তিনি ঐ সমস্ত মুসলিমদের মাথাকে নত করতে চেয়েছেন, যারা মক্কা বিজয়ের দিন অহংকারের সাথে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা) এর ন্যায় মস্তক অবনত করে হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে প্রবেশ করেনি এবং যারা বলেছিল- সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা পরাজিত হবনা। এটি বুঝানোও উদ্দেশ্য ছিল যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই আগমণ করে থাকে।

রাসূল (সা) সেদিন স্বীয় মাথাকে এত নীচু করেছিলেন যে, তাঁর খুতনী বাহনের সাথে প্রায় মিশে যাচ্ছিল।

সুতরাং যখন মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল, তখন তাদের মনে শান্তনা দেয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) এবং মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলার হিকমতের আরও দাবী এই যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পোশাক কেবল বিনয়ীদের উপরই অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল বিবেচনা করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত"। বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হুনাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এই উত্তয় যুদ্ধেই ফিরিস্তাগণ মুসলমানদের পক্ষে স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন। উত্তয়টিতেই নবী (সা) শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এই উভয় যুদ্ধেই আরবদের হিংসার আগুন নির্বাপিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের অন্তরে তয় ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের তেজ কমে গিয়েছিল। আর হুনাইন যুদ্ধ তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা চেষ্টা

কোন প্রকার সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিরাট বিজয় লাভ করে বিজয়ের বেশে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধের ব্যাপারে মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় একটা গিরিপথের কাছে ১২ জন মুনাফিক নবী কারীম (সা) কে হত্যার একটা ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায় এবং তারা ব্যর্থ হয়। মুনাফিক দলটি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গী হুজাইফা (রা) তার ঢালের সাহায্যে

মুনাফিকদের বাহন গুলোর উপর প্রবল ভাবে আঘাত করেন এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। সফর শেষে নবী করীম (সা) যখন দূর থেকে মদিনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন এই যে উহুদ পাহাড় যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালোবাসি। এদিকে মদিনায় রাসুলুল্লাহ (সা) এর আগমন সংবাদ পেয়ে মহিলা ও কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ও তার সাহাবীগণকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। উক্ত যুদ্ধে যে সকল লোক অনুপস্থিত ছিল যারা ছিল অপারগ অথবা ছিল মুনাফিক। তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা প্রকৃত মুমিন ছিলেন এবং কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিলেন আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন। প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে অবস্থান করেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন অতঃপর লোকজনদের জন্য সেখানে বসে পড়েন।

বিদায় হজ্জ:

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

)يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسٰي أَلَّا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ هٰذَا وَقَبْرِيْ(

'হে মোয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে মোয়ায (রাঃ) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী কারীম (সাঃ)-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী কারীম (সাঃ) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমন্ডিত কর্মকান্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহবান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ নেবেন এবং নাবী কারীম (সাঃ) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।

অতঃপর যূল ক্বা'দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

তিনি চুলে চিরুনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যুহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (রাযি.) বললেন,

(أَتَانِيْ اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِيِّ الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)

আজ রাতে আমার প্রভূর পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন, ‘এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম (সাঃ) ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী (সাঃ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু’ রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে ‘লাব্বায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে ‘ক্বাসওয়া’ নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার ‘লাববায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক’রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচচ কণ্ঠে ‘লাব্বায়িক’ ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কার নিকটবর্তী যী’তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে কা‘বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার

উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ (রাঃ) তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নাবী কারীম (সাঃ) বললেন,

(لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيْ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ)

‘আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।’

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম (সাঃ) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، اِسْمَعُوْا قَوْلِيْ، فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً)

'ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ـ وَكَانَ مُسْتَرْضِعاً فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ـ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ).

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

(فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئْنَ فِرَشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ).

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত

করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، طِيْبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَتَحُجُّوْنَ بَيْتَ رَبِّكُمْ، وَأَطِيْعُوْا أُوْلَاتِ أَمْرَكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبَّكُمْ)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভূর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

(وَأَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟)

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ব আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

(اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।

নাবী কারীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহকে রাবী’আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন।রাসূলে কারীম (সাঃ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا) [المائدة: 3]

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি‘মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।’ [আল-মায়িদাহ (৫) : ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই উমার (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন দ্বীনের বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করলো সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।

নাবী কারীম (সাঃ)-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারও ইকামত করলেন। এ দু’ সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্বাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তুপ) সামনে করলেন এবং ক্বিবলাহমুখী হয়ে নাবী কারীম (সাঃ) (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মন্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু’ ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী কারীম (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে

কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে 'আক্বাবাহ এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী কারীম (সাঃ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম (সাঃ) বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (সাঃ) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আলী (রাঃ) এ গোশত খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

(اِنْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يُغَلِّبُكُمْ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)

‘বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু আব্দুল মুত্তালিব নাবী কারীম (সাঃ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছানুযায়ী পান করলেন।

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দন্ডায়মান অবস্থায়। অদ্যকার ভাষণে নাবী কারীম (সাঃ) গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

(إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰي وَشَعْبَانَ)

‘আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা’দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।’

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ভাল জানেন।’ এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (সাঃ) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?’ আমরা বললাম, ‘তা কেন হবে না’? এর পর নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, ‘এ শহরটি কোন্ শহর?’ আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।’ নাবী কারীম (সাঃ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ শহর কি মক্কা নয়’? আমরা বললাম তা কেন হবে না’? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী কারীম (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন্ দিবস’? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন’। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়’? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়’? আমরা বললাম অবশ্যই’। তিনি বললেন,

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا)

‘তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضَلَالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভূর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা

এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, অতঃপর নাবী কারীম (সাঃ) বললেন,

(اللهم اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰي مِنْ سَامِعٍ)

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক' যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম (সাঃ) এ কথাও বলেছিলেন,

(أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلٰى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَبَداً، وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَسَيَرْضٰى بِهِ)

স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। (অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে। অপরাধের জন্য নিজেকেই গ্রেফতার হতে হবে)। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ১১, ১২, ও ১৩ যুল হিজ্জাহ (আইয়ামে তাশরীক) মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহবানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী কারীম (সাঃ) আইয়ামে তাশরীকেও

ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সারায়া বিনতে নাবহান (রাঃ) বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

(أَلَيْسَ هٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ الْتَشْرِيْقِ)

এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয় কি? নাবী কারীম (সাঃ)-এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাজিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ ১৩ই যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম (সাঃ) মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বিদা' আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজ্বের নিয়মাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

বিদায়ের লক্ষনসমূহ:

যখন দ্বীনের দাওয়াত পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করল, আরবের পুরো নিয়ন্ত্রণ মুসলিমগণের আয়ত্বে এসে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবেগ ও অনুভূতি, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণ হতে এমন কতগুলো আলামত প্রকাশ পেতে থাকল যাতে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ অস্থায়ী জীবন থেকে বিদায় নিতে এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর ই'তেকাফের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে

পারে। সাধারণভাবে রমাযান মাসে তিনি শেষ দশ দিন ই'তিক্বাফ করতেন। কিন্তু ১০ম হিজরীতে তিনি ই'তিক্বাফ করেন বিশ দিন।

অধিকন্তু জিবরাঈল (আঃ) এ বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু' বার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন যেক্ষেত্রে অন্যান্য বছরগুলোতে মাত্র একবার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন। তাছাড়া নাবী কারীম (সাঃ) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন,

(إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً)

'আমি জানিনা এ বছর পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব কিনা'। জামরায়ে 'আক্বাবাহর নিকট বলেছিলেন,

(خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسَكَكُمْ، فَلَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ بَعْدِ عَامِيْ هٰذَا)

'আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো শিখে নাও। কারণ, এ বছর পর সম্ভবতঃ আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না। আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগে নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট সূরাহ 'নাসর' অবতীর্ণ হয় এবং এর মাধ্যমে নাবী কারীম (সাঃ) উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় সমাগত প্রায়।

একাদশ হিজরী সফর মাসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উহুদ প্রান্তে গমন করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে শহীদদের জন্য এমনভাবে দু'আ করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকেই বিদায় গ্রহণ করছেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

(إِنِّيْ فُرَطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلٰى حَوْضِيْ الْآنَ، وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحُ الْأَرْضِ، وَإِنِّيْ وَاللهَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ، وَلٰكِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا).

'আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী, আল্লাহর কসম! আমি এখন আপন 'হাউযে কাওসার' দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজানাসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এ ভয় হয় না যে, আমার পর তোমরা

শিরক করবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে।[1]

এ সময় একদা মধ্য রাত্রে তিনি 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থান গমন করলেন এবং কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيَهْنَ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيْهِ بِمَا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيْهِ، أَقْبَلَتْ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ آخِرُهَا أُوْلَهَا، وَالْآخِرَةُ شَرٌّ مِنْ الْأُوْلٰي)،

'ওহে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক! দুনিয়ার মানুষ যে অবস্থায় আছে তার তুলনায় তোমাদের সে অবস্থানই ধন্য হোক যার মধ্যে তোমরা রয়েছ। অন্ধকার রাত্রির অংশের ন্যায় অনিষ্টতা একটির পর একটি চলে আসছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম অতীত প্রজন্মের তুলনায় অধিক খারাপ।' এরপর এ বলে কবরবাসীদের শুভ সংবাদ প্রদান করলেন যে,

(إِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ)

'তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরাও আগমন করছি।'

অসুস্থতার সূচনা:

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাকী'তে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামত করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

শেষ সপ্তাহ:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, (أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) 'আমি আগামী কাল কোথায় থাকব, আমি আগামী কাল কোথায় থাকব?'

এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবেন।'' বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (সাঃ) স্থান পরিবর্তন করে আয়িশার গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন আবূ ত্বালীবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে তিন চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নাবী কারীম (সাঃ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আয়িশা (রাঃ) সূরাহ নাস ও ফালাক্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক মুখস্থকৃত দু'আ পড়ে নাবী কারীম (সাঃ)-কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নাবী কারীম (সাঃ)-এর হাত তাঁর পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন

(هَرِّيْقُوْا عَلَيَّ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ آبَارٍ شَتَّي، حَتَّى أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، فَأَعْهَدُ إِلَيْهِمْ)

'আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিকে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (সাঃ)-কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই (حَسْبُكُمْ، حَسْبُكُمْ) 'ক্ষান্ত হও', ক্ষান্ত হও' বলতে থাকলেন।

সে সময় নাবী কারীম (সাঃ)-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ (রাঃ) আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন,

(لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)

‘ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নাবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। অন্য এক রেওয়াতে রয়েছে

(قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)

ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি যে তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে বানিয়ে নিয়েছেন।[1] তিনি আরও বললেন,

(لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ)

তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন,

(مَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهٰذَا ظَهْرِيْ فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهٰذَا عِرْضِيْ فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ)

‘আমি যদি কারো পিঠে কোড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।’

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। তারপর আবারও মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, ‘আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নাবী কারীম (সাঃ) ফযল বিন

আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, ‘তাঁকে পরিশোধ করে দাও’। এরপর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

(أُوْصِيْكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كِرْشِيْ وَعَيْبَتِيْ، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ)،

‘আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।’

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,

(إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ، وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُوْنُوْا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وُلِيَ مِنْكُمْ أَمْراً يَضُرُّ فِيْهِ أَحَداً أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيُقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيْئِهِمْ).

‘মানুষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু আনসারগণ কমে যেতে থাকবে। এমনকি তারা হয়ে পড়বে খাবারের মধ্যে লবণের ন্যায়। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোন লাভ কিংবা ক্ষতি পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে তখন সে যেন তাদের মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং অসৎ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দেয়।

‘এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করেছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এক জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।’ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবূ বাকর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম।

লোকেরা বলল, ‘এ বুড়োকে দেখ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা

আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, যে আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বান্দাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,

(إِنَّ مْنِ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، وَلٰكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِيْ بَكْرٍ).

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবূ বাকর (রাঃ) এবং আমি যদি আপন প্রভূ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাকর (রাঃ)-কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবূ বাকর (রাঃ)-এর দরজা ছাড়া।

ওফাতের একদিন পূর্বে:

ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকটে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন। রাত্রিবেলা গৃহে বাতি জ্বালানোর জন্য আয়িশাহ (রাঃ) প্রতিবেশীর নিকট থেকে তেল ধার করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি লৌহবর্ম ত্রিশ ‘সা’ (৭৫ কেজি) যবের পরিবর্তে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।

পবিত্র জীবনের শেষ দিন:

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নাবী কারীম (সাঃ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) নিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন। আনাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নাবী কারীম (সাঃ) সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী কারীম (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাত্বিমাহ (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাত্বিমাহ (রাঃ) বললেন যে, নাবী কারীম (সাঃ) আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নাবী কারীম (সাঃ)-এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

অধিকন্তু নাবী কারীম (সাঃ) ফাত্বিমাহ (রাঃ)-কে এ শুভ সংবাদও প্রদান করেন যে, তুমি হবে মহিলা জগতের নেত্রী।

ওই সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাত্বিমাহ (রাঃ) কোন চিন্তা ভাবন না করেই চিৎকার করে উঠলেন ‘হায় আব্বাজানের কষ্ট! নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, আজকের পরে তোমার আববার আর কোন কষ্ট নেই।

নাবী কারীম (সাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহবান জানালেন এবং ওযায ও নসীহত করলেন।

এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খায়বারে খাওয়ানো হয়েছিল। সে সময় তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন,

(يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهٰذَا أَوَانٌ وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ أَبْهَرِيْ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ)

‘হে আয়িশা! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরা সমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে।

তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত : (তিনি বললেন),

(لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - يَحْذِرُ مَا صَنَعُوْا - لَا يَبْقِيَنَّ دِيْنَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ)

আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে। তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখন্ডে আর কখনো এ দু’টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উপদেশ প্রদান করে বললেন

(الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

অর্থ : সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)! এ শব্দগুলো নাবী কারীম (সাঃ) বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা:

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। আয়িশা (রাঃ) নাবী কারীম (সাঃ)-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নাবী কারীম (সাঃ) আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলাভ আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবূ বাকর (রাঃ) নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নাবী কারীম (সাঃ) মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাথা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নাবী কারীম (সাঃ)-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি মিসওয়াক খানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু' হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন,

(لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ....)

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।[1]

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। আয়িশা (রাঃ) কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন,

(مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، اللهم اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰي. اللهم، الرَّفِيْقُ الْأَعْلٰي).

‘হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভূক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ’লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! রফীক্বে আ’লা।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্য্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নাবী কারীম (সাঃ)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দুর্ঘটনার সংবাদ তৎক্ষনাত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীগণের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্ত এবং পার্শ্বস্থ সব কিছুই যেন অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখি নি।[1]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুতে ফাত্বিমাহ (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন,

يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، (مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ

অর্থ: ‘হায় আব্বাজান! যিনি আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়েছেন, হায় আব্বাজান! যাঁর ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস, হায় আববাজান! আমরা জিবরাঈল (আঃ)-কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি।

উমার(রা) ও আবু বকর (রা) এর অবস্থান :

নাবী কারীম (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর হুশ বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক্ব মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মুসা বিন ইমরান (আঃ) গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত্রি অনুপস্থিত

থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) সুনহ'তে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর লোকজনদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন। নাবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। আবূ বাকর পবিত্র মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন,'আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আল্লাহ আপনার উপর দু'বার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। সে সময় উমার (রাঃ) লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'উমার বসো'। উমার (রাঃ) বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ (রাযি.) উমার (সাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন,

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيْ اللهُ الشَّاكِرِيْنَ) [آل عمران:144].

'আল্লাহর প্রশস্তির পর, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূজা করতেছিল তারা জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতেছিলে, অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল বিগত হয়ে গেছেন তাতে কি, তবে কি যদি নাবী মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ামির ভরে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে,

স্মরণ রেখো, যারা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেয়া হবে।' [আল 'ইমরান (৩) : ১৪৪]

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন আবূ বাকর (রাঃ)-এর এ ভাষণ শ্রবণের পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবূ বাকর (রাঃ) যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে ওয়াকেফহাল হলেন এবং সকলকেই এ আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাঃ) বলেছেন যে, 'উমার (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি যখন আবূ বাকর (রাঃ)-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করলাম। (অথবা আমার পিঠ ভেঙ্গে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আবূ বাকর (রাঃ)-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, নাবী কারীম (সাঃ) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

রাসুল ﷺএর দাফনকাফন:

এদিকে নাবী কারীম (সাঃ)-এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নাবী কারীম (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাকীফা বনু সায়েদার মধ্যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং রাত্রি আগমন করে। লোকজনেরা নাবী কারীম (সাঃ)-এর কাফন-দাফনের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি

অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত নাবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারক একটি জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা আবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস নাবী কারীম (সাঃ)-কে কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন আব্বাস, আলী, আববাসের পুত্র ফযল এবং কাশেম (রাঃ), রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আযাদকৃত দাস শাকরান, উসামা বিন যায়দ এবং আওস বিন খাওলী (রাঃ)। আব্বাস, ফযল ও কাশেম (রাঃ) নাবী কারীম (সাঃ)-এর পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছেলেন। উসামা এবং শাকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আলী (রাঃ) ধৌত করছিলেন এবং আওস নাবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহকে তিনবার কুল পাতার মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ বিন খায়সামাহ 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কূপের পানি পান করতেন।

গোসলের পর তিনটি কুরসুফ হতে তৈরী সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

নাবী কারীম (সাঃ)-এর অন্তিম আরামগাহ (শান্তি শয্যা) সম্পর্কে সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, 'আমি নাবী কারীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন নাবীকে (পৃথিবী) থেকে উঠানো হয় নি (মৃত্যুবরণ করেন নি) তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' এ মীমাংসার পর নাবী কারীম (সাঃ) যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন আবূ ত্বালহাহ (রাঃ) তা উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর তার নীচে বগলী কবর খনন করা হল।

এরপর সাহাবীগণ (রাযি.) পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম নাবী কারীম (সাঃ) পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর

ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন।

সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাত্রে নাবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠক, আমরা আযযা ওয়া জালের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনী শুরু থেকে শেষ করার জন্য আমাদের তাওফীক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিই রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সাথে কিয়ামতের দিন মিলিত হবেন এবং তাঁর হাতে হাউযে কাউসারের পানি পান করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক প্রাপ্ত হবে। এই সীরাহ নিজেকে বদলে দেওয়ার জন্য, নিজেকে রাসূলুল্লাহর আদলে গড়ে তোলার জন্য। রাসূলুল্লাহ • যেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসতেন, উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন, আমরাও সেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসবো। রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি আর সম্পদ

তিনি ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র এই দ্বীন ইসলামকে আমার-আপনার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। সেজন্য আমাদের উচিত অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহর প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকা।

যে মানুষ আল্লাহর বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না, আর পৃথিবীতে আমরা রাসূলুল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যা-কিছু-জানি তার সবটাই তো তাঁর কাছ থেকে জানি! এই ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারবো না, তবে নূন্যতম আমরা যেটা করতে পারি তা হলো রাসূলুল্লাহর অবদান স্বীকার করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা, তাঁর আনীত দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর তাঁর মর্যাদাকে রক্ষার জন্য নিজের জান দিয়ে দেওয়া।

সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি।

আল্লহুম্মা সল্লি আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ

তিনিই আমাদের প্রাণের নবীজি।

তথ্যসূত্র:

১.যেমন ছিলেন তিনি(শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ)

২. আর রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা সফিউর রহমান মবারকপুরী (রহ.)

৩. সীরাহ্ - রেইনড্রপস মিডিয়া

৪.সিরাতে খতামুল আম্বিয়া

৫. https://www.hadithbd.com/

৬. https://bn.m.wikipedia.org

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111576210/